The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Volume 39, June 2025, ISSN 1813-0402

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা: সমস্যা ও সমাধানের উপায়

[Establishment of Islamic Statement in the Modern World: Problems and Ways to Solution]

Md. Yeamin Hossain
M.Phil Fellow, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Volume 39, June 2025
ISSN: 1813-0402 (Print)

DOI:

Received : 26 February 2025
Received in revised: 23 October 2025
Accepted: 13 October 2025
Published: 10 November 2025

Keywords:
Islamic state, Sharia, governance, justice, equality, challenges, solutions.

ABSTRACT

An Islamic state is a system of governance based on Islamic principles, where the Qur'an and Sunnah guide laws and policies. This paper examines the concept of an Islamic state, its objectives, and the challenges faced in the modern world. It also proposes practical solutions for its establishment. The main aim is to provide effective and realistic guidelines to overcome obstacles in implementing an Islamic state in contemporary Muslim societies, through analyzing common questions, objections, and misconceptions. Establishing an Islamic state today faces many challenges. These include disunity among Muslims, misunderstandings about Sharia law, resistance to democratic methods, negative media coverage, Protection and rights of non-Muslims, domestic and foreign conspiracies, international pressures, terrorism, radicalization, extremism, and Islamophobia. These challenges make it difficult to apply Islamic principles in modern social, political, and economic systems. Therefore, in establishing an Islamic state, all forms of extremism should be avoided, and practical decisions should be made regarding political opponents. The Muslim community should adopt a moderate approach, provide correct guidance, and stay firm in the truth. This will strengthen unity and brotherhood, making the path to a stable and successful Islamic state easier. Solutions include promoting education, awareness of Islamic teachings, strong leadership, consultation, peaceful dialogue, and international cooperation.

ভূমিকা

মতবাদ বিভ্রান্ত বিশ্বের মুসলমানরা একটি কার্যকর ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে লড়াই-সংগ্রাম করে যাচ্ছে। মানব জাতিকে ইসলামের মূল শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে,মদিনা থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত তথা নবী সা. এর সময়কাল থেকে উসমানি সালতানাত পর্যন্ত মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উপস্থিতি ছিল এক চরম বাস্তবতা। ইসলাম ঐক্যের আদর্শ। মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী সকল বিরোধ-বিভেদের অবসান ঘটিয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই এই সুমহান আদর্শের আগমন ঘটে। রাসুলুল্লাহ সা. মদিনায় হিজরত (৬২২খ্রি.) পরবর্তী সময়ে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বিরাজমান সকল অনৈক্যের নিরসন ভবিষ্যৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয় । কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মীয় বিষয়ে চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইসলাম ও ইসলামী দলের সমালোচনায় মুখর তা নয়, ইসলাম সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই তারাও ইসলামবিদ্বেষীদের সাথে এই বাড়াবাড়িতে যোগ দিয়েছে। অথচ ইসলামের পতাকা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে মধ্যমপন্থিদের মাধ্যমেই পৌঁছেছে। বর্তমানে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এ আন্দোলনের অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টির ফলে ইসলাম বিদ্বেষীরা আন্দোলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, প্রোপাগান্ডাসহ জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলনের গতিপথ রুদ্ধ করার হীন অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা সেক্যুলাররা ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন মতবাদের নামে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে বের করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করছে। পশ্চিমা সভ্যতার শোষণতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে যে মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়েছে তা ইসলামী আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামপন্থীদের একাংশ ধর্ম ও

রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে ভুল ধারণা ও অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে পাশ্চাত্যধারার ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে ইসলামী আদর্শবিরোধী বা কুফরি মতবাদ হিসেবে অভিহিত করেন এবং সেই প্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কাঠামোর স্থান স্বীকারে অনীহা প্রকাশ করেন। এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু অমুসলিমদের মাঝে ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়ে এক অজানা ভয় ও শঙ্কা কাজ করে। ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পথে নারীবাদীদের কিছু বক্তব্য আরো মারাত্মক। তাদের অনেকে যুক্তি দেন যে ইসলাম ধর্মে নারীর সমতার বিষয়টি যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। বর্তমানে আধুনিক বিশ্বে কাঙ্ক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনৈক্য, শরি'আহ আইনের কঠোরতা বিষয়ক অপপ্রচার, গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের বিরোধিতা, প্রতিকূল মিডিয়া, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের জিম্মীদশা, দেশি বিদেশী ষড়যন্ত্র, আন্তর্জাতিক ক্রুসেডীয় চক্রান্ত, জঙ্গিবাদের অব্যাহত প্রচারণা, র‍্যাডিকেলাইজেশন তথা ইসলামে চরমপন্থা, ইসলামোফোবিয়া এবং বৈশ্বিক প্রতিকূল অবস্থা ইত্যাদি বিষয়সমূহ বাধাগ্রস্ত করছে। এমতাবস্থায় ইসলাম বিরোধী শক্তিদের অপতৎপরতা রোধে মুসলিম উম্মাহকে কুরআনে বর্ণিত সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় ঐক্যে গড়ে তুলতে হবে যেন ইসলামও উন্নত বিশ্বের অপরাপর রাষ্ট্রসমূহের মতোই শরি'আহ ভিত্তিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রকাঠামো উপস্থাপন করতে পারে। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো আধুনিক মুসলিম বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিরুদ্ধে উত্থাপিত নানা প্রশ্ন, আপত্তি ও ভুল ধারণার যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের কার্যকর ও বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

এই গবেষণায় "আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাঃ সমস্যা ও সমাধানের উপায়" বিষয়টি বর্ণনামূলক-বিশ্লেষণধর্মী (Descriptive-Analytical) পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক উৎস হিসেবে পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থ এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের রচনা ও মন্তব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে ইসলামী রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি ও নৈতিক দিক সম্যকভাবে প্রতিফলিত হয়। গৌণ উৎস হিসেবে বিভিন্ন একাডেমিক বই, গবেষণাপত্র, জার্নাল, সাময়িকী এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন প্রকাশনা ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক (Thematic) ও তুলনামূলক (Comparative) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, যা আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাব্য সমাধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণে সহায়তা করেছে। গবেষণার পরিধি মূলত তাত্ত্বিক ও নীতিগত এবং কোনো নির্দিষ্ট দেশের কেস স্টাডি এতে অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণাটিকে একাডেমিকভাবে প্রাঞ্জল ও যৌক্তিক করে তুলেছে, যা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ক আলোচনায় সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণ সমর্থিত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

আধুনিক মুসলিম বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শগত নানা প্রতিবন্ধকতা এই প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছে। এ প্রেক্ষিতে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষকরা বিষয়টির অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধান করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি, বাস্তব প্রয়োগ এবং সমসাময়িক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ আধুনিক ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করেছে। এই চিন্তাবিদদের মধ্যে সমকালীন ইসলামী বিশ্বে অন্যতম প্রভাবশালী গবেষক ও লেখক হিসেবে ড. ইউসুফ আল-কারজাভির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর '*সেক্যুলার ও ইসলামপন্থিদের বয়ানে ইসলাম ও রাজনীতি* গ্রন্থে,' মার্কসবাদী কিংবা সেক্যুলার সমাজের ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য 'ধর্মের মাঝে কোন রাজনীতি নেই আর রাজনীতির মাঝেও ধর্মের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই' বিষয়টি নিয়ে তিনি যৌক্তিক আলোচনা করেছেন।[১] ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের সংযোগের বিষয়ে তিনি বলেন,''মানুষের চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা সৃষ্ট বলেই গণতন্ত্রকে নাকচ করা যায় না। কেননা, মানুষের সৃষ্ট সকল কিছুই নিন্দনীয় ও পরিতাজ্য নয়। ইউসুফ আল কারজাভির অন্য আর একটি আন্তর্জাতিক মানের গ্রন্থ '*মিন ফিকহি আদ দাওলাহ ফিল ইসলাম* ' বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত 'ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ'। এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের কতিপয় মূলনীতি যেমন ইসলামে রাষ্ট্রের মর্যাদা, রাষ্ট্রের অবকাঠামো, প্রকৃতি, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় রাষ্ট্রের সঠিক রূপরেখা, বৈশিষ্ট্য, গণতন্ত্র, বহুদলীয় রাজনীতি, নারী ও অমুসলিম প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। অরুণ কুন্দনানির 'Islamophobia in the Western World' গ্রন্থে পাশ্চাত্য সমাজে ইসলামোফোবিয়া, সন্ত্রাসবিরোধী রাজনীতি এবং বর্ণবাদী প্রবণতার বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।'পাশ্চাত্য সন্ত্রাসবিরোধী ঘরোয়া যুদ্ধের ইসলামোফোবিক ও বর্ণবাদি চরিত্র' গ্রন্থে 'আদর্শ শত্রু 'ডোর অব হোয়াইটনেস, চরমপন্থা প্রতিরোধে রাজনীতি, 'দ্য মিথ অব র‍্যাডিক্যালাইজেশন' সহ আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতার বিভিন্ন দিক তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন।[২] বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমানের '*ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ*' গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্রের উৎপত্তি, খিলাফতের ক্রমবিকাশ, খিলাফত সম্পর্কিত মতবাদ ও ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় নিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন। ইসলাম ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর মত হলো,'ইসলামের অনুষ্ঠান, জুমা,নামাজ,

হজ যাকাত, জিহাদ প্রভৃতি কেবল আত্মিক উন্নয়ন সাধন করে না,' বরং তা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমন্বয় সাধন করে। এগুলোর রাজনৈতিক মূল্য অনেক বেশি। রিসালাহ একটি ভিত্তি এবং খিলাফত সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।''[৩] আরব বিশ্বের অন্য এক কিংবদন্তি লেখক ড. উমার সোলাইমান আশকার রচিত 'আল্লাহর আইন পরিবর্তনে পৃথিবীর কী ক্ষতি হলো' গ্রন্থে ইসলামী ভূখণ্ড থেকে কীভাবে শরি'আহ আইন বাতিল করা হলো, কারা চক্রান্ত করে শরি'আহ আইন বাতিল করল, কীভাবে মানব সৃষ্ট আইনকে কার্যকর করা হলো, মানব সৃষ্ট আইন প্রণয়নকারীদের ব্যাপারে বিধান কী?' প্রভৃতি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।[৪] জাস্টিস মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানীর 'ইসলাম আওর সিয়াসী নযরিয়্যাত' (ইসলাম ও রাজনীতি) গ্রন্থে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ,গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক দিকসমূহ, রাজনৈতিক দল ও নির্বাচনাদি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি গণতন্ত্রকে সবচেয়ে ফ্যাশনেব্‌ল রাজনৈতিক দর্শন বলেছেন। তার মতে,'গণতন্ত্রের ফলে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটেছে। তবে লিবারেল ডেমোক্রেসি সেক্যুলারিজম ছাড়া চলতে পারে না। তাই তিনি গণতন্ত্রকে 'শাসক মূলত জণগন' না বলে বলেছেন 'জনগণের কর্তৃত্ব'। তিনি আরো বলেন,'গণতন্ত্র কোনো চারিত্রিক মূল্যের কাছে আবদ্ধ নয়, কোন আসমানী হেদায়াত দ্বারাও সিক্ত নয়; বরং জনগণের মর্জি এবং খায়েশের উপরই তার পরিপূর্ণ ভিত্তি।[৫] ড. হাফিজুর রহমান তাঁর 'ইসলামী রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রধারণা' গ্রন্থে ইসলাম ও রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট, আধুনিক রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী রাষ্ট্রধারণার বিকাশ সহ ইউসুফ আল কারজাভির ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্ব, রশিদ আল ঘানুসির ইসলামী রাষ্ট্রধারণার উপর আলোচনা করেন। এছাড়া মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহিম তাঁর 'ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা' গ্রন্থে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্রের কাঠামো ও কার্যাবলীর বিশ্লেষণ করেছেন।[৬] ড. মুনীরউদ্দীন আহমদের 'ইসলামী অর্থনীতি ও কল্যাণ রাষ্ট্র' সম্পর্কিত বইটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক দিক তুলে ধরেছেন।[৭] মুহাম্মদ আসাদ (The principle of state and Government in Islam) গ্রন্থে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি বিষয়ে যুগোপযোগি আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি আমাদের সমস্যা, ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যসমূহ, শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, নাগরিক ও সরকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশন করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধতাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দের পার্থক্য নিরূপণের জন্য স্থায়ী কোনো আদর্শ বা মানদন্ড নেই। এই ধরনের রাষ্ট্রের একমাত্র মানদন্ড হলো জাতির স্বার্থ। রশিদ আল-ঘানুসির অতি সম্প্রতি 'Public Freedom in Islamc State' নামে এর ইংরেজি ভার্সন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়ালে ইউনিভার্সিটির প্রেস থেকে প্রকাশিত। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমত: ইসলামী রাষ্ট্রে জনস্বাধীনতা এবং মানবাধিকার, দ্বিতীয়ত: ইসলামে গণতন্ত্রের স্বরূপ এবং তৃতীয়ত: ইসলামী রাষ্ট্রতত্ত্ব। এই তিনটি মূল বিষয়ের মাধ্যমে তিনি তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা খুব স্পষ্টভাবে এবং দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি,'' গণতন্ত্র বিদআত কিংবা হারামের মতো বিষয়গুলো প্রত্যাখান করেছেন। ঘানুসির বলেন,''গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণাগুলো ইসলামী তত্ত্ব 'শুরা' এর বাস্তব প্রতিফলন। তিনি উল্লেখ করেন,''আজকে পশ্চিমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মূল কারণ গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্র না থাকা মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণ।[৮] বিংশ শতাব্দীর অন্য যে কোনো ইসলামী চিন্তাবিদের তুলনায় অত্যন্ত গোছানো ও সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা উপস্থাপন করেছেন মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর 'Islamic Law and Constitution' গ্রন্থে তিনি বলেন, "ইসলামী রাষ্ট্রে একটি আদর্শ রাষ্ট্র, যা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।"[৪] মওদূদী পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে পৃথক একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন, যাকে তিনি "থিও-ডেমোক্রেসি"(Theo-Democracy) নামে অভিহিত করেছেন। এখানে সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত অধিকারী আল্লাহ তা'আলা, কিন্তু জনগণ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে শাসন পরিচালনা করে।[৯]

আধুনিক বিশ্ব ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

আধুনিক বিশ্ব বলতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বোঝায়। আর রাষ্ট্র বলতে এমন এক রাজনৈতিক কাঠামো যার মাধ্যমে কোন ভূখন্ডের অধিবাসীরা নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে নিজেদের সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র বলতে ইসলামী শরি'আহ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বোঝায়। রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী জীবন ব্যবস্থারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হবস (১৫৮৮-১৬৭৯) 'Leviathan' নামে বইয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে মতবাদ প্রকাশ করে দাবি করেন রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের আগে মানুষ 'প্রকৃতির রাজ্যে' বসবাস করত। সে রাজ্যের মানুষ সামাজিক অরাজকতা থেকে মুক্তি পেতে পরস্পর মিলে যে সামাজিক চুক্তি (Social Contract) করে তার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ও সরকারের উৎপত্তি হয়। ইংল্যান্ডের অপর একজন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী জন লক (১৬৩২-১৭০৪) 'Two treaties of Civil Government' নামে বিখ্যাত বইয়ে হবসের মত তিনিও প্রাকৃতিক রাজ্যের (Natural State) কথা বলেন যে রাজ্যে মানুষ প্রথমে শান্তিতে ছিল । কিন্তু ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ ও নিরপেক্ষ বিচারক ও শাসকের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ অনুভূতি থেকে সকল মানুষ একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের জন্য একটি সামাজিক চুক্তি করলে

সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।[১০] তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বয় উক্ত সামাজিক চুক্তির দেশ ও সময়ের কথা প্রকাশ করেননি। অথচ তাদের অনেক বহু আগে পৃথিবীতে প্রেরিত প্রথম মানব আদম ও হাওয়া আ. এর মাধ্যমে মক্কার আরাফার ময়দানে গড়ে ওঠে প্রথম মানব সভ্যতা। তাই ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতা (৩১৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), ইতালির রোমান সভ্যতা (২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), গ্রিক সভ্যতা (৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), ইরাক ও ইরানের ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (১৮৯৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), চৈনিক সভ্যতা (১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো সভ্যতা (২৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), সিন্ধুসভ্যতা (৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), হরপ্পা সভ্যতা (২৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ), আদ ও সামূদ জাতীর সভ্যতা, কখনোই রাষ্ট্র ও সরকারবিহীন অবস্থায় ছিল না।[১১] তাই পৃথিবীতে রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের পূর্বে মানবসমাজ তথাকথিত প্রকৃতির রাজ্যে (state of nature) অবস্থান করত-এই ধারণা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং এটি কেবল পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তায় গঠিত একটি কল্পনামূলক ধারণা।

ইসলামী রাষ্ট্র বলতে আল-কুরআনের অনুশাসন ও রাসুলুল্লাহ সা. এর সুন্নাহর ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থাকেই বোঝায়।[১২] প্রফেসর ড. বেলাল হোসেনের মতে,' কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী শরি'আহর উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে [১৩]। ড. খুরশিদ আহমদের মতে,' যে রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ ইসলামী আইন কানুন দ্বারা পরিচালিত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে সে মোতাবেক অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হয় তাই ইসলামী রাষ্ট্র। আল মাওয়ার্দীর মতে,''দ্বীনের সংরক্ষণ, পার্থিব রাজনীতি এবং জনগণকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলে।"[১৪]যে রাষ্ট্রের আইন,শাসন ও বিচার বিচার ব্যবস্থার কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে গড়ে উঠে তাই ইসলামী রাষ্ট্র।[১৫] মুহাম্মদ আসাদ বলেন,'' একটা রাষ্ট্রকে তখনই ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায়, যখন সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানগুলো জাতির জীবনে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং সে দেশের মৌলিক শাসন-সংবিধানে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"[১৬] যে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা, নীতি-নির্ধারণ, প্রশাসন ও আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও রীতি নীতি পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। এ রাষ্ট্র আল্লাহর আইন তথা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত বিধি-বিধান এবং নির্দেশনাবলী কার্যকর হবে। এ রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর একচ্ছত্র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম চলবে না। তিনি যেমন সৃষ্টিকর্তা তেমনি নির্দেশ দাতা।[১৭] সমাজের সকল স্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এ রাষ্ট্রে প্রধান উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্য এ রাষ্ট্রের সুবিচার নীতি সমভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং শাসকদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন।[১৮] পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এ রাষ্ট্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে ভালো ও মন্দের বিষয়ের সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ হয়।[১৯] সুনীতির প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির উচ্ছেদ ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম কাজ। [২০] এ আয়াতটিতে শাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। যার বাস্তবায়ন খোলাফায়ে রাশেদাসহ প্রথম শতাব্দীর ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। যাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা যমিনে ক্ষমতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

''তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন।[২১] ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতি হবে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে পুঁজিবাদের আধিপত্যকে হ্রাস করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সংকটকে সমৃদ্ধিশালী করা। এছাড়া দ্বীনের সংরক্ষণ করা, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা অর্জন করতে সহায়তা করা, সম্পূর্ণভাবে জনগণের রায় নিয়ে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে নীতি ও আদর্শের উপর এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ রাষ্ট্রের শাসকগণ মূলত জনগণের প্রতিনিধি। তাঁরা তাদের কাজ-কর্ম ও দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ও জনগণের নিকট দায়ী থাকবে। এ রাষ্ট্রের নাগরিকরাই নির্ধারণ করবে কারা তাদের শাসক হবেন । তারা শাসকের প্রতিটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তের আনুগত্য করবেন এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনমূক কাজের বিরোধিতা করবেন। কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য হয় না।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমস্যাসমূহ

১. ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার প্রয়াস

পাশ্চাত্য, সেক্যুলার[২২]ও মার্কসবাদী(১৮১৮-৮৩) সমাজ এ বলে অপপ্রচার চালায় যে ধর্ম স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত পবিত্র ও নিরঙ্কুশ আর রাজনীতি মানবসৃষ্ট। মানুষের রাজনৈতিক জীবন ও কর্মের বিষয়ে ধর্মীয় কোনো নির্দেশনা থাকতে পারে না। রাজনীতির সাথে দুর্নীতি, প্রতারণা কিংবা অস্বচ্ছতার সংমিশ্রণ রয়েছে। ধর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরকালীন জীবনের সফলতা অর্জন আর রাজনীতির উদ্দেশ্য জাগতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন । তারা ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপনের হীন প্রচেষ্টা চালায় যেখানে ধর্ম শুধু আকিদা চর্চার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে, তাতে শরি'আহর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। ইবাদাত থাকবে কিন্তু মুয়া'মালাত[২৩] তথা পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়ে কোন নির্দেশনা থাকবে না। দ্বীন থাকবে কিন্তু জাগতিক বিষয়াবলীর সাথে দ্বীনের কোন সংশ্লিষ্টতা থাকবে না।

দাওয়াত থাকবে কিন্তু রাষ্ট্র গঠন বা পরিচালনার বিষয়ে কোনো আলোচনা পর্যালোচনা থাকবে না। তারা আরও প্রচারণা চালায় ধর্মের সাথে কোনো রাজনীতি নেই আর রাজনীতির মাঝে কোনো ধর্মের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে না। ধর্মীয় কিতাবে লিখিত সীমিত অনুশাসন দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হলে তা সংকীর্ণতার রূপ লাভ করবে। যদি তা করা হয় তাহলে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে রাজনীতি ভূমিকা না রেখে ধর্মের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এর কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা রাজনীতির চিরাচরিত নীতি হচ্ছে তা সদা পরিবর্তনশীল। সমকালীন সমাজ ও পরিস্থিতির বিবেচনায় রাজনীতি নানা রূপ লাভ করে আর ধর্মের স্বভাব ও প্রকৃতি হচ্ছে অকাট্য, স্থির ও অপরিবর্তনীয়। যেখানে নিত্যনতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি বিদ'আত বলে বিবেচনা করা হয়। কাজেই এ দুটো ভিন্নতর বিষয়ে কখনো এক হয়ে চলতে পারে না।[২৪] ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সংযোগ বিষয়ে সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির সারকথা হলো ধর্ম রাজনীতি থেকে এবং রাজনীতি থেকে ধর্ম পুরোপুরি পৃথকভাবে অবস্থান করবে। এ বক্তব্যের মাঝে নিকোলো মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭) চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে [২৫]। যিনি রাজনীতিকে ধর্মতত্ত্ব হতে সম্পূর্ণ আলাদা করে বিচার করেছেন। তিনি মনে করেন উদ্দেশ্য সাধন করাটা মূল বিষয়, কীভাবে তা অর্জন করা হলো সেটি মুখ্য বিষয় নয়। ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) দর্শন আরো মারাত্মক। তিনি ধমীয় স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার পক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বলেন,'' ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়।'[২৬] মানুষের ব্যবহারিক জীবন পদ্ধতি হবে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় বিধিনিষেধের আওতামুক্ত। ইসলাম হচ্ছে আধ্যাত্মিক প্লাটফর্ম মাত্র। সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রকাঠামোর সংশোধন, অপরাধের শাস্তির বিধান, অর্থব্যবস্থার সুষম বণ্টন ইত্যাদি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদিতে এর কোন ভূমিকা থাকবে না।

২. ইসলামে গণতন্ত্র চর্চা নিয়ে বিতর্ক

গণতন্ত্র (Democracy) মূলত এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস জনগণ। অন্যদিকে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌমত্ব (sovereignty) একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর।"[২৭]এখানেই বিতর্কের সূচনা 'গণতন্ত্রের দাবি জনগণের ইচ্ছাই সর্বোচ্চ আইন' অথচ ইসলাম বলে 'আল্লাহর আইনই সর্বোচ্চ'। ফলে অনেক ইসলামী চিন্তবিদ মনে করেন, গণতন্ত্র ইসলামী তাওহিদি রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সরাসরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ইসলামপন্থিদের একটা বড় অংশ মনে করে 'গণতন্ত্রের দিকে আহ্বানকারীরা শারীরিকভাবে মুসলমানদের ভূখন্ডে বসবাস করলেও মন মানসিকতা ও ধ্যানধারণায় কুফরি পশ্চিমা সমাজে বসবাস করে।' তারা ইসলামের সাথে এর সংযোগকে পুরোপুরি নাকচ করে। আর এ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনকারীদের প্রত্যাখান করে কাফির ও মুরতাদ বলে দোষারোপ করে। তাদের মতে গণতন্ত্রের ভিত্তি হলো জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আইন প্রণয়ন ও আনুগত্যের মালিক জনগণ, আল্লাহ তা'আলা নন।[২৮] তাদের মতে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত বিধান আর গণতন্ত্র মানুষের সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ﴾ ''আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তাঁরা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে।''[২৯] তাদের যুক্তি হলো গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমের কথা বলা হয়েছে। যা মানুষকে চূড়ান্ত ক্ষমার উৎসে পরিণত করে এবং আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয়।[৩০] পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান ও সেক্যুলার সমাজের হাত ধরে গণতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে যারা জীবন পদ্ধতির সাথে ধর্মের সংশ্লিষ্টতাকেই মৌলিকভাবে অস্বীকারসহ আল্লাহর উলুহিয়াত, আম্বিয়াদের নবুয়াত ও পরকালীন জবাবদিহিতাকে গোমরাহি মনে করে। তাঁরা আরো বলেন গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম ও আকিদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতার মূলনীতির ওপর। গণতন্ত্রের ছায়ায় মানুষ ইচ্ছানুযায়ী আকিদা পোষণ করতে পারে। তাই পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। জনগণই একমাত্র ফায়সালা দানকারী; যাদের কাছের বিভিন্ন মতানৈক্য ও বিবাদের বিচার নিয়ে যাওয়া হয়। এটি তাওহিদের মূলনীতির পরিপন্থী। তাওহিদের মূলনীতি হলো সমস্ত মতবিরোধের একমাত্র বিচারক হলো আল্লাহ তা'আলা। তাছাড়া গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে বাক-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের ওপর। তাদের যুক্তি হলো ইসলামে কোন মন্দ কথার স্বাধীনতা নেই। গণতন্ত্রে আর একটা মারাত্মক মূলনীতি হলো রাষ্ট্র, রাজনীতি ও জীবন থেকে ধর্মবিচ্ছেদ তথা সেক্যুলার মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা। অবাধ স্বাধীনতা, একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন, সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভোট ও নির্বাচন প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে পরামর্শ বা শূরা-র নীতি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তাদের কার্যাবলি পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।"[৩১] গণতন্ত্রের মতোই শূরাও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু পার্থক্য হলো-শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কুরআন ও সুন্নাহর সীমার মধ্যে; গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। ইসলামে চূড়ান্ত সীমা আল্লাহর বিধান অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠও শরি'আহর বিরূদ্ধে যেতে পারে না।

৩. শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত কুর'আনের আয়াতের বিষয়ে উম্মাহর মতবিরোধঃ

যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করে না কুরআনের তাদেরকে কাফির, ফাসিক কিংবা যালিম বলে তিরস্কার করা হয়েছে।[৩২] একদল ইসলামপন্থি মনে করে এ আয়াতগুলো আহলে কিতাব তথা ইহুদী-নাসারাদের

উদ্দেশ্য নাযিল হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ﴾ 'তোমার উপর আল্লাহ তা'আলা যে আইন-কানুন নাযিল করেছে তুমি তা দিয়ে এদের মাঝে ফায়সালা করো' [৩৩]। তাদের দাবি এ আয়াত কিতাবী তথা অমুসলিমদের বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, মুসলমানদের বিষয়ে নয়। তাছাড়া আয়াতে উল্লিখিত ফায়সালা ছিল বিচার বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত। ঢালাওভাবে তা দ্বারা শাসনকাজ পরিচালনা কিংবা আইন প্রণয়ন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যা কেবল রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক, কিংবা কার্যনির্বাহী কমিটি তথা রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপ্রধানগণ কিংবা মন্ত্রিপরিষদ ইত্যাদির দায়িত্ব। আইন প্রণয়ন কমিটি যেমন পার্লামেন্ট, সিন্ডিকেট, সিনেট, ইত্যাদির দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও রহিতকরণ। আবার অনেকেই বলে থাকেন মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনের এ সব আয়াতে ব্যবহৃত 'শরি'আহ' শব্দটি দ্বারা আকিদা, বিশ্বাস, আখলাক, সৎ ও ভালো গুণাবলি অর্জনের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ঐসব আয়াত কোনক্রমেই ইসলামী শরি'আর বিধি বিধানকে বোঝায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [৩৪]। অন্যদিকে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আলি আবদুর রাজ্জাক দাবি করেন,' ইসলাম মানুষকে দ্বীন চর্চার দিকে আহ্বান করে। রাষ্ট্র বা হুকুমত প্রতিষ্ঠার কোন দলীল প্রমাণাদি ইসলামে অবকাশ নেই ।[৩৫] ইসলাম আধ্যাত্মিক তথা রুহানিয়াত ও তাজকিয়াতুন নফসের উন্নতি সাধণের জন্য কাজ করে। দ্বীন চর্চার সাথে সাংঘর্ষিক রাষ্ট্রপরিচালনার মতো দুনিয়াবি স্বার্থ নিয়ে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না, যা দ্বীন চর্চার সাথে সাংঘর্ষিক একটি পথ চলা। এছাড়া সূরাহ্ আন-নুরের ৫৫ নম্বর আয়াতটি সাহাবিদের যুগের সাথে সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের সাথে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলিফা (প্রতিনিধি) করবেন, যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলিফা করেছিলেন। আর তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এবং তাদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এরপরও যে অবিশ্বাসী হবে, তারাই ফাসিক'। সূরাহ্ নিসার ৫৮-৫৯ নম্বর আয়াত শাসকগোষ্ঠী ও মুলিম জনসাধারণের উদ্দেশ্য অবতীর্ণ হলেও এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবির মতে তা রাষ্ট্র কিংবা হুকমত গঠনের দিকে আহবান করেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ – إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ – إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً﴾

''নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'' আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ – فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও।'[৩৬]

৪. বৈশ্বিক ঔপনিবেশিক আগ্রাসন

উপনিবেশবাদ আধিপত্যের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলিমদের শিক্ষাব্যবস্থা। বৃটিশ শিক্ষাবিদ লর্ড ম্যাকলে এর মতে [৩৭] 'উন্নত মানের ইউরোপীয় লাইব্রেরির একটি সেলফ বই সমগ্র আরব ও ভারত উপমহাদেশের দেশীয় সাহিত্য ও দর্শন হতে উন্নত '।[৩৮] বৃটিশ শিক্ষার চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত এ উক্তি প্রাচ্য শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে তার স্থলে ইংরেজি শিক্ষা চালু করে। নাইজেরিয়ার লুগার্ড লর্ডও অনুরুপ মন্তব্য করেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো দেশীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে ইউরোপীয় শিক্ষানীতিকে ব্যবহার করে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও সংস্কৃতির শিকড় বিস্তৃত করা। এর মাধ্যমে এমন একটি শ্রেণি সৃষ্টি করা যারা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি, চিন্তা-চেতনা, নীতি-নৈতিকতা, ধ্যান-ধারণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে হবে ইংরেজ মানসিকতা সম্পন্ন। যার ফলে ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ইসলামী শিক্ষাকে বিলুপ্ত ও শরি'আহ ব্যবস্থাকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। কোথাও যদি ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুমোদন দেয়া হতো তবে তা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ব্যক্তিগত উদ্যোগে হতো। তবে যেখানে সরকারি অনুদান দেয়া হতো সেখানে আনুষ্ঠানিক ও পুনর্জাগরণের নামে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাক্রম চাপিয়ে দেয়া হতো।[৩৯] ফলে উপনিবেশিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত মুসলিম সমাজ ধীরে ধীরে নিজেদের সাংস্কৃতিক

ঐতিহ্য ছেড়ে দিয়ে বিজাতীয় পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্যবোধ বরণ করে নিলো। তাদের সমাজের মডেল অনুসারে নিজেদের সমাজের মডেল পুনর্গঠন করল। তাদের অনুকরণে নিজেদের জীবন ধারারও পরিবর্তন আনল। ১৮০০ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপের রেঁনেসা বা পুনর্জাগরণ, Reformation Movement এবং ফ্রান্সের মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলনের প্রভাব ১৮০০ শতকের শেষে ও ফরাসির বিপ্লবের পরে বজায় ছিল। যার দর্শন ছিল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বাপারে ধর্মের কোনো ভূমিকা থাকবে না। যুক্তিই হবে জীবনের ভিত্তি। যে কারণেই হোক এই আন্দোলন ইউরোপের তৎকালীন নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। সভ্যতার ধারক বাহক রূপে পরিচিত খ্রিষ্টবাদ, বাণিজ্য ও উপনিবেশবাদ শ্রেণির ত্রিশক্তির সাফল্য হলো শিক্ষা থেকে ধর্মকে আলাদা করা। এভাবে যে সব স্কুল প্রতিষ্ঠা হলো তাতে মানুষ স্বার্থপর ও ভোগবাদী হয়ে পড়ল। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। নীতিহীনতা ও স্বার্থপরতা নিয়ে মানুষ গড়ে উঠল। এর স্থলে যে জেনারেল পলিটিশিয়ান ও চিন্তবিদরা তৈরি হলো। তাদের মনের গভীরে এই চিন্তা স্থায়ী হলো যে জনসমাজের জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই। এর প্রভাব কার্যকর হলো সকল ক্ষেত্রে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামী নেতৃত্ব শ্রেণিকে ধ্বংস করে দিল। পাশ্চাত্যে আইনশাস্ত্রে শিক্ষিত দেশীয় শ্রেণিবর্গ দ্বারা আইন ও ফিকহ শাস্ত্রের আলেমদের ধ্বংস করা হলো। তারা সমাজে উদারনৈতিক শিক্ষার বীজবপন ও সমধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল। তাদের চিন্তা চেতনার আলোকে দেশের সংবিধান গড়ে উঠল। যে জাতীয়তাবাদ মানবজাতীকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করে, পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ সে জাতীয়তাবাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদী নীতিমালার ইতিবাচকতা প্রচার করল। তারা জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোশাল ডারইউনিজম প্রবেশ করল। Survival of the fittest-কে মূলমন্ত্র করে নেয়া হলো। কেবল যোগ্যরাই টিকে থাকবে। এর মানে যারা যোগ্য নয় তারা ধ্বংস হউক তাতে কোন আসে যায় না। এখানো কোন নীতিবোধ বা দয়ামায়ার স্থান নেই। এটাই ছিল সোশাল ডারউইনিজমের, যা ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের বিরোধী, ইসলাম ধর্মের বিপরীত।[৪০] সেকুলারিজম বা মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন অর্থনীতির ক্ষেত্রে গডকে বাদ দিয়ে চিন্তা করার রীতি চালু করল। পুঁজিবাদ যখন সেক্যুলারিজমের সঙ্গী হলো তখন ইউরোপে শ্রমিককে শোষণ করা হলো। এর প্রতিক্রিয়াতে কমিউনিজমের জন্ম হলো। সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হলো। অর্থনীতিতে নীতিহীনতা ও অমানবিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। মুক্তবুদ্ধি ও সেক্যুলারিজমের ফল হলো মানুষ মুখে মুখে স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও গণতন্ত্রের কথা বলে। তাদের রাজনৈতিক আচরণ ছিল নীতিহীনতা। তারা পরস্পর মারামারি করল। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ভারত দখল করে নিতে চেষ্টা করল। শেষে ইংল্যান্ড একাই একটা অঞ্চল দখল করল। মুক্তবুদ্ধির ধারণা গ্রহণ করে পুরো শিক্ষিত সমাজ মোটামুটি সেক্যুলার হয়ে গেল। আমেরিকা, ফ্রান্স ব্রিটেন ও স্পেনীয়রা লড়াই করল। পর্তুগাল মোজাম্বিক এলাকার দখল নিল। ডাচেরা সাউথ আফ্রিকাসহ কিছু এলাকা নিয়ে নিল । উত্তর আফ্রিকা নিল ইতালি ও ফ্রান্স। ধর্মকে বাদ দিয়ে তৈরি হওয়া সমাজ দুনিয়া দখল করল, লুটতরাজ করল, এবং নিজেদের মধ্যে লড়াই করলেও শান্তি আনতে ব্যর্থ হলো। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিচালনা করল। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই প্রক্রিয়ায় ফ্যাসিজম, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম ও সেকুলারিজম জন্ম নিল।

৫. মুসলিম উম্মাহর মতবিরোধ ও অনৈক্য

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হলেও তা একটি সম্মিলিত শক্তির প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অর্জন করে। ঈমান হচ্ছে এ প্রচেষ্টার ভিত্তি ও আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার আশায় কাজ করা। পুনর্জাগরণের জন্য যখন মুসলমানেরা সচেতন হয়, তখন তাদের মধ্যে আত্মপ্রেরণা ও চাঞ্চল্য অনুভূতি কাজ করে। যার ফলে সে স্বত:স্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোরআনের ছায়াতলে মুসলিম উম্মাহকে একত্রিতকরণ, আল্লাহর বন্ধুদের প্রতি সমর্থন, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই, অমুসলিম নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলিম ভূখন্ডকে পুনরুদ্ধার, শরি'আর দাবী অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধসহ জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ তা'আলার বিধানকে সমুন্নত করার সংগ্রামে ব্রতী হয়।[৪১] ইসলামের শিক্ষা হলো মুসলমানরা পরস্পর ভাইভাই; এক অপরের পরিপূরক। তাই তারা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে সুদৃঢ় সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য সমাজের ন্যায় ইসলামী সমাজে অনৈক্য তথা বিরোধের অস্তিত্ব দেখা যায়। বর্তমান মুসলমানদের পারস্পারিক বিরোধ এতো তীব্র আকার ধারণ করেছে যে তাদের একটি দল নিজেদের হক ও অন্যদের বাতিল বলে মনে করে। অকাট্য নয় এমন দলিল প্রমাণাদি তাদের কাছে অকাট্য, মুতাশাবিহ[৪২] দলিল মুহকাম[৪৩], অস্পষ্ট দলিল স্পষ্ট এবং আম দলিল খাসে পরিণত হয়েছে। যার ফলে তারা কাফিরদেরকে মুসলিমদের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। আবার কখনো ইজতিহাদি ও ফিকহি অনেক মত, মতাদর্শ কিছু কিছু মুকাল্লিদের[৪৪] হাতে পরিবর্তন হয়ে গেছে যা ইজতিহাদি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজ। ফলে তারা নিজ স্বার্থানুযায়ী কুরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা করে। যে আয়াত নিজ চিন্তা বিরোধী তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বা রহিত বলে উড়িয়ে দেয়। এসব মতবিরোধের কারণ হলো মূল আকিদা ও বিশ্বাসের বিভেদ, মূল আকিদার শাখা-প্রশাখা বিষয়ে মতানৈক্য, শরি'আতের প্রয়োগ পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান রসম-রেওয়াজ বিষয়ে

ভিন্নমত পোষণ। এছাড়া ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অভাব, রীতি-নীতি গোলামীর অনুসরণ, পারস্পরিক অনাস্থা, ঘৃণা-বিদ্বেষ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দাসত্ব, চিন্তা ও কর্মের বিরোধই মূলত মুসলিম উম্মাহর অনৈক্যের কারণ।[৪৫] সাঈদ নূরসীর মতে,'' ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের অনুধাবনের অজ্ঞতা, বিশ্বাসগত আত্মিক শিক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতির অভাব, গর্ব অহংকারের সীমালঙ্ঘন, ক্ষমতা অনুধাবনের সীমালঙ্ঘন, কাজের মূল্যায়ন না করা, শৃঙ্খলা বিধানের অভাব ও কাজের অদক্ষতা, আধিপত্যের প্রাধান্য মানুষের অন্তরের মাঝে, অহংকার, আমিত্ব, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার জন্ম দেয় যা একতা বিনষ্ট করে।[৪৬] এছাড়া মুসলিম উম্মাহর স্বার্থরক্ষায় ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সংগঠন ওআইসির ৫৭টি দেশ দৃশ্যমান কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

৬. ইসলামী রাষ্ট্র ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদেরকে "আহলুজ্জিম্মা" বলা হতো। তারা রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও অধিকার ভোগ করতেন, বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট কর (জিজিয়া) প্রদান করতেন। আহলুজ্জিম্মা ব্যবস্থা মূলত ইসলামী শাসনব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল, যা মুসলিম এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতো। এই ব্যবস্থায় অমুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন করতে সক্ষম ছিলেন এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল, তবে তারা রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারত না। অপরদিকে, আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকত্বের ধারণা সমঅধিকারভিত্তিক, যেখানে সকল নাগরিক-মুসলিম ও অমুসলিম আইন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিক অধিকারসমূহে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। আধুনিক নাগরিকত্বের মূল লক্ষ্য হলো ধর্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য না রাখা এবং সকল নাগরিককে সমান রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা। ফলে, আহলুজ্জিম্মা ব্যবস্থার তুলনায় আধুনিক নাগরিকত্ব অধিকতর সমতা এবং রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।[৪৭] এই কারণে সমালোচকরা উল্লেখ করেন যে, জিম্মি ব্যবস্থা অমুসলিমদের নাগরিক অধিকার সীমিত করে। তারা মুসলিমদের সমান রাজনৈতিক অবস্থান ভোগ করতে পারে না। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু সেক্যুলার প্রবক্তা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে বলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সংখ্যালঘুরা সংকটের মুখে পড়বে এবং ইসলামের আধিপত্যবাদী নীতির কারণে কঠিন নির্যাতনের সম্মুখীন হবে। তাদের যুক্তি অনুযায়ী, ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের আহলুজ্জিম্মা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা তাদের স্বাধীনতা সীমিত করবে। এছাড়া, তাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ, কর্মক্ষেত্রে বঞ্চনা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। এই সমস্ত দাবি ব্যবহার করে তারা ইসলামকে ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং চায় ইসলাম রাষ্ট্র থেকে দূরে সরে থাকুক। তাদের এই প্রচারণা অনৈতিক এবং অগণতান্ত্রিক, এবং ইসলামী রাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ ধরনের অযৌক্তিক প্রোপাগান্ডা চালানো। হয়। এছাড়া সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ইসলামী রাজনৈতিক দলের কোন পলিসি নেই বললেই চলে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠনের নেতৃত্ব কেবল মুসলিমদের জন্য।[৪৮] সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হলো-অমুসলিমরা কি ইসলামী রাষ্ট্রে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হতে পারবে? যেমন: তারা কি সংসদ সদস্য, মন্ত্রী বা বিচারক হতে পারবে? তারা কি রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে?

৭. ইসলামী রাষ্ট্রে নারী ও মানবাধিকার

সেক্যুলারদের দাবি ইসলামী শরি'আর আলোকে যদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারের ধারাসমূহ বাস্তবায়ন চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হবে। এছাড়া ইসলামী শরি'আর বিধানাবলি মানবাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে না। ইসলামে ধর্মে প্রবেশ করার পর ধর্মত্যাগের শাস্তির ভয়ে আর বের হওয়ার সযোগ থাকে না । যা স্বাধীনভাবে ধর্মপালনকে চরমভাবে বাঁধাগ্রস্থ করে। এছাড়া নারীদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, নারীদের স্বাধীনভাবে চলাফেলা করা, বিয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি ও পরামর্শের বাধ্যবাধকতা, তালাক বা বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছার প্রতিফলন না থাকা, অবাধ মেলা, পোশাকের স্বাধীনতা ইসলামী শরি'আহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া নারীবাদীদের [৪৯] দাবি ইসলামে নারীর সমতাকে স্বীকৃতি দেয়া নেই। নারীদের জন্য পর্দা প্রথার কথা বলা হয়েছে যেখানে পুরুষ অভিভাবক ছাড়া চলাফেরা না করার বিধান আছে। এর ফলে নারীর সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকে সীমিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীর নেতৃত্ব স্বীকার করে না।[৫০] ইসলাম ধর্মে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারে তাকে পুরুষের সমান দেয়া হয়নি। নারী ও পুরুষ সকলেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া অনস্বীকার্য। গত পঞ্চাশ বছরে সমাজ অনেকটা এগিয়েছে। এ সময় পুরুষের সাথে নারীরা সমান না হলেও এগিয়েছে। সারা পৃথিবীতে নারীর ওপর যে অত্যাচার চলছে তার একটা Ideological foundation আছে। নারীদের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞার এবং নির্যাতনের মূল কারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি । যেমন পুরুষরা বিশ্বাস করে নারীরা পুরষের চেয়ে ছোট। এ বিশ্বাস নারীদের মাঝেও বিদ্যমান। শিল্পবিপ্লব ও ইউরোপের দেশগুলোর বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্য সমাজের সবচেয়ে শোষিত, বঞ্চিত ও নিগৃহীত

নারী সমাজ গৃহকোণ থেকে বাইরে চলে আসে। নারীরা পুরুষের সমান অধিকারের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। পুরুষের আরোপিত বাধা নিষেধের সমস্ত বেড়াজাল ছিন্নভিন্ন করে তারা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করতে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজের মতো আমদের সমাজের নারীরাও এক অন্ধকূপে আটকে পড়ে। মুসলিম সমাজে, বিগত কয়েকশো বছরে পুরুষের কর্তৃত্বের কারণে মুসলিম নারীর স্বাধীনতা সীমিত হয়ে গেছে। তারা পাশ্চাত্য সমাজের মতো শোষিত, অধিকারহীন ও বঞ্চিত। ফলে নারীরা তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সোচ্চার হয়েছে। ইসলামে এদেরকে কি অধিকার দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁরা সজাগ নয়। এ বিষয়ে সজাগ হওয়া এদের পক্ষে অতটা সহজও নয়। এই অসচেতনতা গত হাজার বছরের ফসল। একদিনে নয় ধীরে ধীরে আমাদের সমাজ অনৈসলামী সমাজের রীতি-রেওয়াজ প্রভাবিত হয়েছে। ইসলামী সমাজ যে ধারায় অগ্রসর হয়েছিল, নবী স. যে সকল সরল ও স্বাভাবিক সামাজিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তা কালক্রমে ব্যাহত হয়।[৫১]

৮. সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস ইসলামী সংস্কৃতি কিংবা পলিটিকাল ইসলাম বিষয়ে প্রোপাগান্ডা

পশ্চিমা দুনিয়ার মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা ইসলামকে প্রায়শই সভ্যতা, মানবতা ও শান্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা মনে করে ইরাক ও সিরিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের কর্মকান্ডই প্রকৃত ইসলামের প্রতিফলন। এই ভুল ধারণা মুসলমানদের ভয়ঙ্কর সহিংস চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ, সামরিক কেন্দ্র ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মার্কিন প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ "ওয়ার অন টেরর"-এর অংশ হিসেবে র‍্যাডিকালাইজেশন[৫২] প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের ধারণা অনুযায়ী আটলান্টিকের উভয়পাড়ের মুসলিম যুবকরা ক্রমশ জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হচ্ছে। তবে এই নীতিমালা প্রাথমিকভাবে ভিত্তিহীন অনুমানের ওপর নির্মিত। তারা ইসলামী মতাদর্শকেই জঙ্গিবাদের মূল কারণ হিসেবে উপস্থাপন করে। অধিকন্তু, পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা মুসলিমদেরকে তাদের আইডিওলজিকাল শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে, এবং দেখায় যে তারা জাতিগত, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিকভাবে পৃথক। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চরিত্রকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক প্রচারণা চালাতে সহায়ক। [৫৩] পশ্চিমাদের মাঝে ওয়ার অন টেরর-কেন্দ্রিক মৌলিক দুটো ভাবনা কাজ করে। একটি ভাবনা কনজারভেটিভ অর্থাৎ রক্ষণশীলরা লালন করে এবং অন্যটি লিবারেল বা উদারপন্থীরা লালন করে। রক্ষণশীলদের মতে, সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস হলো ইসলামী সংস্কৃতি, যার আধুনিকতার সাথে খাপ খাওয়ার সক্ষমতা নেই। অন্যদিকে উদারপন্থীদের মতে, সন্ত্রাসবাদের মূল ইসলাম নয়, বরং বিশ শতকের কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ যারা রাজনৈতিক ইসলামের ভিত্তি নির্মাণ করেছে। সেজম্যান ও ভিক্টোরিওভিচ উভয়ই বিশ্বাস করেন, র‍্যাডিকালাইজেশন মৌলিকভাবে ধর্মতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক কর্মকান্ডের ফলস্বরূপ ঘটে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি মতবিশ্বাস ও ধর্মীয় পরিচয় ধারণ করে নির্দিষ্ট দলবদ্ধ পরিচয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত হয় বা সমর্থন করে। তাদের এই মতামত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা (ইনটেলিজেন্স) সেক্টর গ্রহণ করে। [৫৪] কোন মুসলিম যদি মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিরোধী হয়, তবে নিশ্চিতভাবেই সে সন্ত্রাসী।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায়

১. ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার প্রয়াস অযৌক্তিক

ইসলামে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি একই সূত্রে গাঁথা। মুসলিম উম্মাহর সর্বজনীন বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলাম কেবল ধর্মীয় অনুশাসন নয়, বরং এটি এক সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা, যেখানে আধ্যাত্মিকতা ও রাষ্ট্রীয় শাসন পরস্পর পরিপূরক। রাসুলুল্লাহ সা. ইসলামকে দীন ও রাষ্ট্র উভয় রূপে প্রতিষ্ঠা করে মানবজীবনের পূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীন (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) এই আদর্শের উত্তরসূরি হিসেবে ইসলামী সমাজে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। এই ধারাবাহিক নেতৃত্বব্যবস্থাকেই ইসলামে খেলাফত বলা হয়। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় কিংবা ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার ম্যাকিয়াভেলি ও ভলতেয়ারের রাজনীতির এ দর্শন গ্রহণযোগ্য নয়। রাজনীতির বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে অনীহা সৃষ্টির উদ্দেশ্যই সেক্যুলার ও আধুনিকতাবাদের ধারক-বাহকেরা পলিটিক্যাল ইসলাম পরিভাষাটি মুসলিম সমাজের চিন্তায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। অথচ ইসলামী শরি'আহর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যারা কাজ করে তারা এমন একটি ব্যাপক ইসলামের কথা বলেছেন যা আকিদাহ্ ও শরি'আহ, ইবাদাত ও মুয়ামালাত, দাওয়াত ও দাওলাহ তথা সকল বিষয়াবলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। কবি ইকবাল বলেন, 'মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের মূলেই রাষ্ট্রনীতি নিহিত থাকে'।[৫৫] রাজনীতির সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ কিংবা নীতি-নৈতিকতার সমন্বয় না হলে মানুষের জীবনে প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। রাজনীতির মাঝে ধর্মীয় মূল্যবোধের সংযোগ ঘটার অর্থ হচ্ছে জনগণের মাঝে সমতা বিধান, ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, দুর্বল ও অসহায়দের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। যখন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ রাজনীতির মাঝে প্রবেশ করে তখন কোনভাবেই তা ক্ষতির দিকে ধাবিত হয় না। রাজনীতিতে দ্বীন প্রবেশ করার ফলে মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষমাত্রা অর্জনের পথ সুগম হয়। ধর্ম রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চিন্তার শুদ্ধতা

ও প্রাণবন্ত মননের সৃষ্টি করে যা তাকে হারাম উপার্জন কিংবা নেতিবাচক চিন্তা থেকে বিরত রাখে। নেতৃবৃন্দের মাঝে এমনভাবে জবাবদিহিতার অনুভূতি সৃষ্টি করে যার ফলে তারা প্রকাশ্যভাবে জনসাধারণের হাতে অভিযোগ ও সংশোধনের ভার ন্যস্ত করে। যেমনটি আমরা আবুবকর সিদ্দিক (৬৩২-৬৩৪খ্রি.) রা. এর খিলাফত পরবর্তী ভাষণে লক্ষ্য করি। তিনি বলেন,'যদি আমি কোনো ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করি তবে আমাকে সংশোধন করে দেবেন।' কিংবা উমর রা. এর মতো যিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর বলেছিলেন,'' কেউ যদি আমার মাঝে কোন বিচ্যুতি দেখতে পায় তবে তার দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে সংশোধন করা।[৫৬] তাছাড়া রাজনীতি ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষের মাঝে দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি করে । যার ফলে সে অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হক কথা বলতে দ্বিধা করে না। তারা ভয় করে আল্লাহর এই সতর্কবাণীর,﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ''তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় করো যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু যালিমদের উপরই পতিত হবে না । আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।" [৫৭] রাজনীতির অঙ্গন থেকে ধর্মকে সরিয়ে ফেলার অর্থ হচ্ছে যাবতীয় কল্যাণকে সরিয়ে অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করা। নেক কাজ ও তাকওয়া চর্চার পথ রুদ্ধ করে অন্যায়, যুলুম ও পাপাচারের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া। ফলে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় মূল্যবোধ ত্যাগ করে নিজেদের দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য পছন্দানুযায়ী নিজেদের লোকদের রাষ্ট্রীয়কাজে নিয়োগ ও পদোন্নতি দেয়। এ জন্য হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন,'' আমি তোমাদের নিকট কোনো শাসক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রেরণ করি এ জন্য যে তারা যেন আল্লাহর কিতাব ও নবীর আদর্শ শিক্ষা দেয় আর দ্বীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখে।''[৫৮] রাজনীতিকে যদি ন্যায় নীতির বাঁধনে আবদ্ধ করা না যায় তবে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। নৈতিকভাবে স্বাধীন হতে না পারলে কোন মানুষই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। তাই বলে যে কোন ইচ্ছা পূরণের নাম স্বাধীনতা নয়।[৫৯] আল-কুর'আনে সালাত, সাওম, কিতাল[৬০], কিসাস[৬১], অসিয়তসহ প্রতিটি বিধানের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ 'আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা,হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।[৬২] তন্মধ্যে সালাত ও সিয়াম পালনের বিধানটি ইবাদাতের অন্তর্গত, কিসাস বা দন্ডবিধির বিধানটি ফৌজদারি আইনসংক্রান্ত নীতিমালার অন্তর্গত, আর ব্যক্তিগত জীবনের সাথে অসিয়ত ও কিতাল বা যুদ্ধের বিধানটি আন্তর্জাতিক পরিসরে পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত যা ফরজিয়াতের অন্তর্গত। একটিকে মানা ও অন্যটিকে অস্বীকার করা ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামের আংশিক অনুসরণের প্রবণতাকে জোরালোভাবে প্রত্যাখান করা হয়েছে। বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের লোকদের সুবিধামত ধর্ম পালনের আচরণ প্রকাশ পেলে আল্লাহ তা'আলা তা কঠোরভাবে সতর্ক করেন।[৬৩] পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৪] এছাড়া অমুসলিমদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সা. কে সতর্ক করা হয়েছে। তারা যেন ইসলামের কিছু বিধান পালনের বিষয়ে রাসুলকে সা. বিচ্যুত করতে না পারে।[৬৫] তাই ইসলামের সকল বিধানকে যদি সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা না হয় কখনোই তা ফলপ্রসু হবে না। আকিদাহ,শরি'আহ, আখলাক, ইবাদাত কিংবা মুয়ামালাত সহ ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলী পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিচ্ছিন্ন কিংবা খন্ডিত চিন্তা ও দর্শনকে লালন করে মানুষ কখনোই সফল হতে পারে না। জীবনে ধর্ম চর্চার বিষয়সমূহ ইসলাম দিয়ে সাজিয়ে বাকি দিক ও বিভাগগুলো মানবসৃষ্ট নানাবিদ চিন্তা, দর্শন ও আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতায় পর্যবষিত হবে। তাই ধর্ম চর্চা থেকে রাষ্ট্র কিংবা পুরো জীবনব্যবস্থাকে আলাদা করার কোনো প্রক্রিয়া ইসলামে নেই বললেই চলে। সবকিছুই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ওপর নিবেদিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّ هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا﴾ [৬৬] ''আমি কি আল্লাহ ছাড়া কাউকে হকুমদাতা হিসেবে তালাশ করব।" অন্যত্র বলা হয়েছে, ''তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়?''[৬৭] ইসলামী শরি'আহর বিরুদ্ধে প্রতিটি বিধান জাহিলিয়াত বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং রাজনীতি মানেই ধর্মহীন নয়। বরং রাজনীতিতে ধর্ম প্রবেশের ফলে তা পরিশুদ্ধ হয়।

২. ইসলামে গণতন্ত্র চর্চা নিয়ে বিতর্ক

এক সময় পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগেই মানুষ যখন নগর সভ্যতা গড়ে তুলতে শুরু করে, তখনই রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনৈতিক সংগঠন ও রাজতন্ত্রের সূচনা হয়।[৬৮] রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র,একনায়কতন্ত্র ছিল শাসনব্যবস্থার মাধ্যম। ফেরাউন, নমরুদ, হামান, সকলেই ছিল স্বৈরতান্ত্রিক শাসক। আধুনিক বিশ্বে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা হলো গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন। যে শাসনব্যবস্থায় জনগণের কর্তৃত্ব বজায় থাকে।[৬৯] গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডাইডস সর্বপ্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। তার মতে,'যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে।'[৭০] গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডটাস বলেন,'গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা বিশেষ কোন শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহের হাতে না থেকে সমাজের সদস্যদের হাতে ন্যস্ত থাকে। অধ্যাপক শেলি

বলেন,''Democracy is the form of government in which every one has a share in it.''[৭১] বর্তমান অধিকাংশ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। বিভিন্ন ইসলামী রাজনৈতিক দলের এজেন্ডাতেও রয়েছে গণতন্ত্রের কথা, অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। রাসুলুল্লাহ সা. এর সময়েও পৃথিবীতে রাজতন্ত্র ও ব্যক্তির একনায়কতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের পরিবর্তে তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।[৭২] Macullock V.S Marry land মামলার রায় দিতে গিয়ে আমেরিকার প্রধান বিচারপতি জন মার্শাল বলেছিলেন,''সরকার হলো সকলের জন্য, সরকারের ক্ষমতা হলো জনগণ দ্বারা অর্পিত, সরকার সকলের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সকলের জন্য কাজ করে।'[৭৩] গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো রাজনৈতিক সাম্য। রাজনৈতিক সাম্য না থাকলে কোন সময়েই গণতন্ত্র কার্যকরী হবে না। গণতন্ত্র কার্যকরী না থাকলে উত্তম সরকার বা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিধিবিধান সার্বভৌম জনগণের General will দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে একই গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতিফলন ঘটলেও শাসনব্যবস্থার ভিন্নতা রয়েছে। যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্রে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়ের সংমিশ্রণ ঘটলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। সেখানে গণনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।[৭৪] আবার যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান রাজা বা রাণী হলেও সেখানকার পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক।[৭৫] তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ইসলাম স্বৈরতন্ত্র কিংবা ব্যক্তি একনায়কতন্ত্র কোনোটিই সমর্থন করে না। ইসলাম গণতন্ত্র থেকেও ব্যাপক ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম মানুষের জন্য যে সকল মৌলিক অধিকারের কথা বলেছে তা গণতন্ত্রের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম জনগণও ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং জনগণের নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা চায়। এসব বোঝাতে আজকাল গণতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করা হয়। গণতন্ত্র সমর্থনের বিষয়ে ইসলাম পন্থিদের মধ্যে বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যাঁরা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন তাঁরা প্রচলিত গণন্ত্রের বিপরীত ইসলামী গণতন্ত্রের কথা বলেন। এর ফলে মুসলিম বিশ্বের রাজা-বাদশা ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। এ বিষয়ে সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শব্দগত ম্যারপ্যাচের উর্ধ্বে গিয়ে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা দরকার। কেননা আধুনিক বিশ্বে ইসলামী দলসমূহ, ব্যক্তিবর্গ ও ইসলামী পন্ডিতগণ এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যেখানে সরকার পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে। সকলের মতামত প্রকাশের অধিকার তথা ভোটাধিকার থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, মৌলিক মানবাধিকার রক্ষিত হবে। [৭৬] এ ধরণের শাসন ব্যবস্থ্য় মূল বিতর্কের ইস্যুটি হলো সার্বভৌমত্ব। ইসলামে সার্বভৌম তথা চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলা আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব জনগণের । ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে সার্বভৌমত্ব ও পাশ্চাত্যের সার্বভৌমত্বের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন যে সার্বভৌম ধারণার কোন প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র বিষয়ক বই পুস্তকে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তেমন গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়নি। H. L. A. Hart বলেন,' আধুনিক আইনব্যবস্থা সেই পুরনো মডেলের উপর দাঁড়িয়ে নেই, যেখানে একজন রাজা বা সম্রাট নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আধুনিক রাষ্ট্রে সংসদ আইন তৈরি করে,আদালত ব্যাখ্যা করে,নির্বাহী বাস্তবায়ন করে, সংবিধান এসবকেই সীমাবদ্ধ করে। সুতরাং, 'No body is absolutely sovereign' একজন বা এক উৎসের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা"এই ধারণাটি আর কার্যকর নয়।[৭৭]

ইসলামী দলগুলোর সার্বভৌমত্বের আপত্তি সম্পর্কে ড.ইউসুফ আল কারযাভি বলেন,''কিছু সংখ্যক মানুষের ভয় গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার উৎসে পরিণত করে এবং আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয়। (যদিও আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার) তার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। কারণ আমরা এমন এক মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলছি যারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদ সা. কে তাদের নবী হিসেবে এবং ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে। আশা করা যায় এ ধরণের মানুষ এমন আইন প্রণয়ন করবে না যা ইসলামের অকাট্য নীতি ও সিদ্ধান্তমূলক বিধি-বিধানের পরিপন্থী হবে। ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধানের পরিপন্থী যে কোন আইন বাতিল বলে গন্য হবে এমন একটি অনুচ্ছেদ সংবিদানে সংযোজন করে এ আশংকা দূর করা যেতে পারে। [৭৮] এছাড়া ইসলামে মুসলিম উম্মাকে রাজনীতির ধারক ও বাহক বলা হয়। তারা তাদের সম্মিলিত স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতির দ্বারা ক্ষমতার উপযুক্ত এমন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ন্যস্ত করবেন যিনি ঐ পদের জন্য উপযুক্ত। এছাড়া মুসলিম মিল্লাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্মতি ও যৌথ মতের ভিত্তিতে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন হয়। আল্লামা ইকবালও নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন,'' ইসলামী রাষ্ট্র স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্থিতিশীলতার চিরন্তন বিধান সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির নীতিমালা শুধু ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথেই

সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বরং যেসব শক্তি মুসলিম বিশ্বে কার্যরত রয়েছে তাকে সুসংহত করা অপরিহার্য। তাঁর মতে,'গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি রুহানী ও নৈতিক হয় তাহলেই তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি। ইসলামী রাষ্ট্রকে এ কারণে তিনি রুহানী গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন।'[৭৯] গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে জনগণই নির্বাচন করবে কারা তাদের পরিচালনা করবে এবং কারা তাদের শাসক হবে। জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে তাদের অপছন্দনীয় কাউকে শাসক মনোনিত করা কিংবা তাদের অপছন্দনীয় কোনো শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। সাথে সাথে শাসক যদি কোন ভূল করে তাহলে তাদের সংশোধন ও প্রয়োজনে তাঁকে পদচ্যুত করা বা পরিবর্তন করার অধিকার থাকবে। জনগণের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তাদের উপর কোনো মতবাদ কিংবা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এমন কোনো নিয়ম-কানুন চাপানো হবে না যার সাথে তারা অদৌ পরিচিত নয় কিংবা যা তাদের মনঃপুত নয় । শাসকগোষ্ঠীর কেউ যদি উল্লিখিত মূলনীতির বিপরীত করে তাহলে তার প্রতিদান হচ্ছে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো।[৮০] এটিই গণতন্ত্রের মূল কথা। এখানে মানবতা যে সকল কর্মপদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে তা হচ্ছে নির্বাচন, জনগণের মতামত যাচাইকরণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার অগ্রাধিকার, বহুদলীয় রাজনীতি,সংখ্যালঘুদের অগ্রাধিকার সংরক্ষণ, বিরোধীদলীয়দের অধিকার সংরক্ষণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ। বর্তমানে গণতন্ত্র হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী রাজা-বাদশা এবং শাসকবর্গের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তির রক্ষাকবজ। যদিও মানব জাতির অন্যান্য কাজ কর্মের মতো এতেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মুসলিম উম্মাহর গবেষক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদরা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম কোনো শাসনব্যবস্থা ও উপায়-উপকরণ অনুসন্ধান করতে পারে। নতুন কোন শাসন ব্যবস্থা মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও সহজলভ্য হওয়ার পূর্বপর্যন্ত গণতন্ত্রের মূলনীতিগুলোর সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া উচিত। আদল-ইনসাফ কায়েম, শুরার বাস্তবায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও জালিম অত্যাচারী শাসকবর্গের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া আবশ্যক।[৮১]

৩. শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতের বিষয়ে উম্মাহর মতবিরোধ

কুরআন নির্ভর সুশীল সমাজ পৃথিবীতে এক সময় আবির্ভূত হয়েছিল এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছিল।[৮২] কুরআন ও সুন্নাহতে দ্বীনের এমন কিছু বিধান রয়েছে যে বিষয়গুলোর প্রমাণের জন্য ইসলামী আইন বিশারদদের আলাদাভাবে দলীল প্রমাণ অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বিষয়গুলো এমন কতিপয় সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি বিধানের প্রতিনিধিত্ব করে যে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। তাছাড়া ঐ বিষয়গুলো উম্মাহর জন্য কেবলমাত্র বরকত লাভের জন্য কিংবা তিলাওয়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করার জন্য, বাস্তবায়নের জন্য নাযিল হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে রব হিসেবে, ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে, মুহাম্মদ সা. কে নবী হিসেবে এবং কুরআনকে তাদের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. প্রদত্ত ফায়সালা মেনে চলতে বাধ্য। এছাড়া ইসলামে রাষ্ট্র বা হুকুমত প্রতিষ্ঠার দলিল নেই বলে শায়খ আলী আবদুর রাজ্জাকের দাবি অযৌক্তিক। ইসলামী শরি'আহ, কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন নস সহ ইসলামের ইতিহাস রাষ্ট্রপদ্ধতির নানাবিদ দলীল ও প্রকৃতির স্বাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেবে। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করো তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের উত্তম উপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'[৮৩] এ আয়াতে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন আমানতের যথাযথ সংরক্ষণ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে মানুষের মাঝে ফায়সালা করে। কেননা আদল ও আমানতের প্রতিষ্ঠার ওপর উম্মাহর অস্তিত্ব নির্ভর করে। রাসুলুল্লাহ সা. এর বলেছেন,''যখন আমনাত নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো।[৮৪] এখানে আমানত নষ্ট করা বলতে অযোগ্য লোকের হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا﴾

'হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর ও আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।''[৮৫] এ আয়াতের মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ তারা যেন শাসকের অনুগত হয় । পারস্পরিক

মতবিরোধের বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য রাসুলুল্লাহ সা. এর শরণাপন্ন হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরই শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক। এ থেকে বোঝা যায় যে মুসলিম উম্মাহর একটি রাষ্ট্র থাকবে। সেখানে তাদের শাসক থাকবে এবং নাগরিকরা রাষ্ট্রের প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে শাসকের আনুগত্য করবে। এ ভাবে কুরআনে অসংখ্য আয়াতের সমাহার রয়েছে যা সমাজ, অর্থনীতি, জিহাদ, রাজনীতি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

রাসুলুল্লাহ সা. এর বিভিন্ন হাদিসে খিলাফাত, ইমামাত ও বিচারব্যবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া রাষ্ট্রপ্রধানের বৈশিষ্ট্য, অধীনস্থদের সাথে আচরণ বিধি, কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা, অকল্যাণকর কাজে অসহযোগিতা, নেতৃত্বের সংশোধন পদ্ধতি, সকল পরিস্থিতিতে নেতার আনুগত্যসহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা রয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যেমন আল্লাহর বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ, পরামর্শের আলোকে শাসনক কাজ পরিচালনা, যোগ্য ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ণ, সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায়, সৎকাজের আদেশ সহ অসৎকাজের নিষেধ ইত্যাদি বিষয়াবলি বর্ণিত হয়েছে। মদিনা ছিল ইসলামের প্রথম জনপদ। রাসুলুল্লাহ সা. উক্ত জনপদে এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ করেছেন যে সমাজে শরি'আহর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানের স্থান ছিল না। যেখানে তাঁর নেতৃত্বে নতুন ইসলামী রাষ্টের গোড়াপত্তন হয়। Walt স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে মদিনায় রাসুলুল্লাহ সা. প্রথম ইসলামী রাজনৈতিক-সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৬] রাসুলুল্লাহ সা. ইন্তেকালের পরবর্তী সময় সাহাবিরা ইসলামী রাষ্ট্রের ইমাম নির্বাচনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত সকলের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে আবুবকর রা. এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। মুসলমানরা তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে কোন সময় ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদাভাবে চর্চা হতে দেখেননি।[৮৭] সেক্যুলারিজম উত্থানের পর মুসলিমরা ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথকীকরণের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে। অথচ রাসুলুল্লাহ এ রকম বিষয়ের ভবিষ্যদৎবাণী পূর্বেই করেছিলেন। মু'য়াজ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ বলেছেন, ''জেনে রেখো ইসলামের শক্তি ও বিজয় পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে নিবে। একটা সময় আসবে যখন কুরআন ও সুলতানকে অর্থাৎ ইসলাম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করা হবে। তখন তোমরা কিতাবের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করো না। জেনে রেখ! তোমাদের এমন কতক শাসক হবে যারা বিচারের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ ও নিজেদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। যাদের বিরোধিতা করলে তোমাদের হত্যা করা হবে। আর তাদের আনুগত্য করা হলে তারা তোমাদের গোমরাহির দিকে ফেলে দিবে। সাহাবিরা বললেন,'' হে আল্লাহর রাসূল! এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? তিনি বললেন,' তোমরা ঈসা ইবনে মারিয়ামের অনুসারীর মতো সত্যকে আকঁড়ে ধরে থাকবে। যাদের করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে এবং শুঁলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের ওপর মৃত্যুবরণ করা অবাধ্যতার থেকে উত্তম।''[৮৮] রাসুলুল্লাহ সা. আরো বলেন, ''কোন একজন ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) আনুগত্যবিহীন অবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করল সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করল''।[৮৯] রাসুলুল্লাহ সা. আরো বলেন, مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ''যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আনুগত্য থেকে বের হয়ে এবং জামা'আত বা ঐক্যবদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করল।''[৯০] ইবনে তাইমিয়া বলেন,' রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্যতম এবং বনি আদমের কল্যাণ কখনোই সামষ্টিক প্রয়াস ছাড়া পূর্ণতা লাভ করে না। আর সামষ্টিক কাজ পরিচালনার জন্য একজন নেতা নির্বাচন করা আবশ্যক। রাসুলুল্লাহ সা. বলেন,'' তোমাদের তিন জন যদি সফরে বের হয় তাহলে তারা যেন একজন কে আমির নিযুক্ত করে নেয়।'''[৯১] এছাড়া সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজের নিষেধ, জিহাদ ও আদল প্রতিষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণকান্ড রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছাড়া পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।[৯২] হযরত উসমান রা. বলেছেন,'' কুরআনের মাধ্যমে যেসব অসংগতির সংশোধন সম্ভব নয় তা মহান আল্লাহ তা'আলা সুলতানের মাধ্যমে সংশোধন করেন।[৯৩] কিছু মানুষ রয়েছে যাদের হিদায়াতের জন্য কুরআন সুন্নাহই যথেষ্ট আবার কিছু মানুষ আছে যাদের ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সংশোধন করতে হয়।[৯৪] ইসলামী প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরত্বারোপ করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বেলন, 'যাকে কিতাব দ্বারা সংশোধন করা যায় না, তাকে শাসনদন্ড দ্বারা করে নিতে হয়।'[৯৫]

৪. অমুসলিম তথা অসংখ্যালঘুদের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের ন্যায় ও সুবিচার নীতি সকলের জন্য সমভাবে প্রয়োজ্য। চাই সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক। মুসলিম হলে আত্মবিকাশের বেশি সুযোগ পাবে আর অমুসলিম হলে আত্মবিকাশের কম সুযোগ পাবে এ ধরণের অবস্থা ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্টোর সাথে সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অমুসলিম তথা সংখ্যালঘু বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তিদের বোঝায় যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী নন এবং কোনো দেশের জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে প্রধান ধর্ম বা গোষ্ঠীর তুলনায় কম। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব। এর মধ্যে শিক্ষা ও চাকুরিতে সমতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করে। যেমন, Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948) ও International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966).[৯৬] ইসলামী রাষ্ট্রে

মুসলিম নাগরিকের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা অমুসলিম নাগরিক নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে থাকে। তাদের ওপর অবিচার করা যাবে না। তাদের জানমাল ও ইজ্জত-সম্মানে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মুসলিম সেনাবাহিনী কোন রাষ্ট্র জয় করার পর নতুন ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা দিতেন। 'They gave them choice of embracing Islam or adhering to them old faith. Who embraced Islam was treated equal terms with the muslim.'[৯৭] এ ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের দুটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ﴾ 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে দুনিয়ার সমস্ত লোক অবশ্যই ঈমান আনত, তাহলে কি তুমি ঈমান আনার জন্য মানুষদের উপর জবরদস্তি করবে?''[৯৮] অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ﴾ 'দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।'[৯৯] সাহাবিদের থেকে জিম্মিদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে তাদেরকে তাদের দ্বীন পালনের সুযোগ দাও। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগ থেকে ইহুদি-নাসারা নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সঙ্গে তাদের ধর্মের ইবাদাত পালন করে আসছে। সে সময়কার চুক্তিনামাগুলোতে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ও আইকাবাসীর মাঝে সম্পাদিত চুক্তিপত্র।'[১০০] ইসলামে অমুসলিমদের নিরাপত্তা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং ধর্মীয় বিষয়াদি পালনের সুবিধার্থে আহলুয যিম্মাহ পরিভাষাটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আহলুয যিম্মাহদের[১০১] রাসুলুল্লাহ সা. ও মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন,''যে ব্যক্তি কোন যিম্মীর প্রতি অবিচার করল, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন (আল্লাহর দরবারে) আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।''[১০২] এ ধরণের প্রতিশ্রুতির ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের জীবন, সম্পদ ও অধিকারের পূর্ণনিরাপত্তা লাভ করবে। মুসলিম নাগরিকের মতই তারা সমপরিমাণ অধিকার ভোগ করবে। সমান দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হবে। সকল মাযহাবের আলেমগণ আহলুয যিম্মাহকে দারুল ইসলাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্থায়ী জনগণকে বুঝিয়েছেন। তারা রাষ্ট্রের অন্যান্য জনগণের মতই সুযোগ-সুবিধাভোগ সহ মিলে মিশে বসবাস করবে।[১০৩] জীবিকা উপার্জনের জন্য অমুসলিমরা তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যে কোন পেশা ও কর্ম অবলম্বন করতে পারবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরি, কৃষি ও চাকুরীর প্রভৃতির দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ধর্মীয় পরিচয় নয় একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচন করা হবে। জিজিয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক কর আরোপ মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্য ও সার্বিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করা।[১০৪] এর বিনিময়ে রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা দিবে ও অধিকার আদায় করবে। তাদের মধ্যকার গরিব-অভাবীদের জীবন পরিচালনা ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব রা. এক ইহুদী পরিবারের ভরণপোষণ মুসলিমদের বায়তুল মাল থেকে সরবরাহ করেছিলেন। মুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিকগণ যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কিংবা বহি:শত্রু মোকাবেলায় অংশ গ্রহণ করে তবে তাদের ওপর আরোপিত জিজিয়া কর বাতিল হয়ে যাবে। তবে যাকাতের বিকল্প হিসেবে এক ধরণের কর আরোপ করা হয়। এছাড়া ইসলামের অন্যান্য ধর্মীয় নির্দেশনাবলি তথা বিয়ে, তালাক, সম্পদের উত্তারিধকার বিষয়ে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তারা তাদের বিশ্বাস ও রীতি অনুসারে তা পালন করবে। ইসলামের ইতিহাস এটাও স্বাক্ষ্য দেয় মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিকরা তাদের কিতাব অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতেন। তবে কিছু ফৌজদারি ও অপরাধ বিষয়ক রাষ্ট্রীয় আইন যেমন চুরির জন্য হাতকাটা, ব্যভিচারের জন্য রজম বা বেত্রাঘাত ইত্যাদি মুসলমানদের ন্যায় মানতে বাধ্য থাকবে।[১০৫] কিছু কিছু অপরাধ ও দন্ড বিষয়ক আইন তাদের জন্য প্রযোজ্য নয় যেমন মদ্যপানের শাস্তি যা অমুসলিমদের ধর্মমতে নিষিদ্ধ নয়। তবে রাষ্ট্রের আদর্শ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে যে সব দায়িত্ব পালনের জন্য মুসলিম হবার শর্ত রয়েছে যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপ্রধান, মুসলিম আদালতের কাজী, ইমামতি, খুতবা, আজান ও মসজিদের খাদেম ইত্যাদি পদে অমুসলিমদের নিয়োগ দেয়া যাবে না।[১০৬] যদিও কোন কোন ফকীহ যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে জিম্মি বা অমুসলিমদের নিয়োগ দানের অনুমোদন দিয়েছেন। বিচার কাজ পরিচালনার জন্য ইসলামী শরি'আর বিশেষজ্ঞ হওয়া জরুরী। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে অমুসলিম নাগরিকও কিছু বিচারকার্যে অংশ নিতে পারে।

৫. মুসলিম উম্মাহর মতবিরোধ নিরসণে করণীয়

মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া আল্লাহর নির্দেশ।[১০৭] শাখাগত বিষয়কে কেন্দ্র করে অনৈক্য সৃষ্টি করা, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও বিদ্বেষ ছড়ানো, অন্য মুসলিম ভাইকে কাফির বলা নিষিদ্ধ। আকিদা ও মাযহাবগত বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ জরুরি হয়ে পড়েছে। শাখাগত বা ফুরুঈ বিষয়ে ইখতিলাফ সব যুগেই ছিল। শাখাগত বিষয়কে প্রাধান্য দিতে গিয়ে দ্বীনের অনেক মৌলিক বিষয় পিছনে পড়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী রহ. স্বল্প সময়ের ব্যাবধানে তাঁর মতামত পরিবর্তন করেছিলেন। ইমাম আবূ হানিফার রহ. অনুসারীরা যুগের ভিন্নতার কারণে প্রায়ই এক-তৃতীয়াংশ মাসয়ালায় তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। একই বিষয়ে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের একাধিক মতামত পাওয়া যায়। ব্যক্তি, সময়, যুগ, অবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তনের কারণেই অধিকাংশের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে।[১০৮] অথচ দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করা সকল উম্মাহর জন্য আবশ্যক।[১০৯] যখন কোন বড়

সমস্যা দেখা দেয় তখন ছোট-খাটো বিষয়গুলো নিয়ে মতবিরোধ হওয়ার দলগুলোর দায়িত্ব হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো সকল প্রকার মতবিরোধ ভুলে গিয়ে আল্লাহর যমিনে তার বিধানকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করা। উম্মাহর এই বিপর্যয়ের সময় ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কেবল তারাই পড়ে থাকতে পারে যারা সমস্যার প্রকৃতি নিয়ে অজ্ঞতায় নিমজ্জিত কিংবা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে কেবল স্বীয় আত্মার গোলামী করে।[১১০] অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা বিপর্যয়ের মূল। মতবিরোধ মানেই অনৈক্য নয় বরং কিছু কিছু মত ভিন্নতার মাঝেই রয়েছে ঐক্যের প্রশস্ততা। সালাফদের মাঝে মতবিরোধ ছিলো, শাখাগত মাসআলার বিষয়ে দ্বিমত করেছেন তাই বলে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি কিংবা অন্যকে গালিগালাজ করেননি। বিপরীত মতের রায়ের প্রতি সালাফদের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। মাযহাব, মাসলাক[১১১]ও রায়ের ভিন্নতা সত্ত্বেও সালাফরা পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভ্রাতৃত্বের হেফাযত করে গেছেন। মানুষ মাত্র চিন্তা চেতনা ও কাজে-কর্মে একজন আর জন থেকে ভিন্নমতের হবে। এটা মানব জাতির স্বভাবজাত প্রকৃতি। রাসুলুল্লাহ সা. এর সময়কাল থেকেই মুসলিম সমাজে চিন্তার বিরোধ ও মতের ভিন্নতা দেখা যায়। তাদের এ মতবিরোধের নানবিধ কারণ ছিল। আল্লাহর বিধান কিংবা নবির নির্দেশ বোঝার ক্ষেত্রে চিন্তার ভিন্নতা দেখা যায়। একবার সাহাবাদের একটি দলকে রাসুলুল্লাহ সা. নির্দেশ দিলেন, ''বনূকুরাইযাহ এলাকায় পৌঁছার আগে কেউ আসরের সালাত আদায় করবে না। তাদের একদল আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পরও সালাত আদায় করেনি অন্যদল নির্দেশের উদ্দেশ্যগত অর্থ গ্রহণ করে যথা সময়ে সালাত আদায় করেন। বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সা. জানার পরেও কোন দলের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেননি।[১১২] কোন কোন সময় শরি'আতের কোন বিশেষ বিধান কোন বিশেষ সাহাবির কাছে পৌঁছায়নি, যার ফলে তিনি ভিন্ন মতামত দিয়েছেন এবং বিধানটি যাঁর যাঁর কাছে পৌঁছেছে তিনি আলাদা মত পোষণ করেছেন। যার ফলে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম সাহাবাদের সময়েও মতের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান সময়ে মুসলিম উম্মাহর একতা ও সংহতি খুবই জরুরি। মুসলিমদের অনৈক্য, বিক্ষিপ্ততা ও দূর্বলতাকে কেন্দ্র করে শত্রুরা উম্মাহর ওপর সব দিক দিয়ে আক্রমন করছে। মুসলিম বিদ্বেষীরা ধর্মমত নির্বিশেষে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ইসলামকে আঘাত করবার বাহ্য উপকরণের চাইতে তাদের গোপন উপকরণ অনেক বেশি শক্তিশালী। পাপকাজ, সীমালঙ্ঘন, মুসলিমদের ঐক্যের ফাটল সৃষ্টি, দ্বন্দ্ব-অনৈক্য সৃষ্টি এবং তাদের মাঝে ফাসাদ ও মারামারির বীজ বপনে তারা একে অপরের সহযোগী। কোন অমুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্রে আক্রমণ করে তারা কোন প্রতিবাদ করে না। ফিলিস্তিন, বসনিয়া, হার্জেগোভেনিয়া, চেচনিয়া, আফগানিস্তান, সোমালিয়া প্রভৃতি যার দৃষ্টান্ত। কাফির মুশরিকরা মুসলিম উম্মাহর সামরিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, চারিত্রিক ও আর্থিকভাবে থামিয়ে দিতে সবাই একমত। তারা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিভাবান লোকদের প্রলুব্ধ করে নিতে থাকে। এতসব বিষয়ে তারা একমত যেন মুসলিমদের চিন্তা-চেতনা, স্বভাব-চরিত্র, নষ্ট হয়ে তাদের সারিতে ফাটল ধরে। তাদের দেশগুলো যেন ধ্বংস হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহর প্রতি শত্রুতাই তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। অথচ আমরা মুসলিমরা আমাদের আকিদা এক ও সঠিক, আল্লাহ প্রদত্ত বিশাল এক কিতাব আমাদের রয়েছে; রয়েছে পথ প্রদর্শনের ও সমন্বয়ের বিশাল নববি বার্তা। এতকিছু সত্ত্বেও আমাদের এমন কিছু লোক আছে যাদের কাজই হলো উম্মাহর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা, ঐক্য ভেঙে ফেলা, অনৈক্যের বীজ সরবরাহ করে দেওয়া এবং পরস্পরের মাঝে বিবাদ ও বিরোধ ছড়িয়ে দেওয়া। এসব করেও তারা মনে করেন তারা দ্বীনের সহযোগী, বিশ্বাসের হিফাযতকারী, শরি'আতের প্রচারকারী, সালাফ সালিহিনের অনুসারী। বাস্তবতা হচ্ছে এরা সবাই এসব শব্দের অর্থ বিনাশকারী এবং বন্ধন ছিন্নকারী।[১১৩] অথচ মুসলমানদের মাঝে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছিল একটি আবশ্যিক বিষয়। মহান আল্লাহ তা'আলা পারস্পরিক বিরোধিতা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

''তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে করো, আর বিবাদে লিপ্ত হয়োনা; তাহলে তোমাদের সাহস হারাবে, দূর হবে তোমাদের শক্তি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।''[১১৪] সাঈদ নূরসীর[১১৫] দৃষ্টিতে, 'ইসলামী বিশ্বে স্থবিরতা ও পশ্চাৎপদতার মূল কারণই হচ্ছে মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ। তিনি বলেন, ''আমার মতাদর্শ হচ্ছে ভালোবাসার প্রতি অনুরাগ এবং শত্রুতার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন''। তিনি লিখেছেন, ''কুরআনের শত শত আয়াতে ও হাদিসে যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা ও ভালোবাসার কথা বলা আছে তা চর্চা করুন। আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের মুসলিম ভাই-বন্ধুদের সাথে এমন বন্ধন গড়ে তুলুন, যা পৃথিবীর যে কোন বন্ধনের চাইতে শক্তিশালী হবে।''[১১৬] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঐক্য বিধানের পন্থা বর্ণনা করে বলেন, ﴿وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۚ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ﴾ ''আর তোমরা খোদাভীতি ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহায়তা করো না।''[১১৭] মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতিতে ভেদাভেদের অবসান ঘটিয়ে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা যথেষ্ট হবে না, এ জন্য

সমবেত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইসলাম সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে এবং বিচ্ছিন্ন থাকার বিরোধী। সমবেত প্রচেষ্টার সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে । আর যে বিচ্ছিন্ন থাকে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এ কঠিন বাস্তবতায় এটি স্বাভাবিক যে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। কুরআনে বর্ণিত আছে,'' ﴿اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِه صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ﴾ ''নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যাঁরা তাঁর রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে তাঁরা সীসা ঢালা প্রাচীর''। [১১৮]

৬. ইসলামী রাষ্ট্র মানবাধিকারের সংরক্ষক

অধিকার বলতে বোঝায় এমন এক বৈধ ও ন্যায্য দাবিকে, যা একজন ব্যক্তি সমাজে বা রাষ্ট্রে অন্যের বিরুদ্ধে উত্থাপন করতে পারে এবং যা রাষ্ট্রের আইন ও নৈতিকতার দ্বারা স্বীকৃত।[১১৯] আর মানবাধিকার বলতে সেই সব অধিকার বোঝায় যা নিয়ে কোনো মানব শিশু পৃথিবীতে এসেছে এবং যা অর্জিত হলেই সে মানুষ হিসেবে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং মতামত প্রকাশের যোগ্যতা নিয়েই জন্মায় । ইসলামে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সম্মানিত করার কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا﴾ নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।''[১২০] মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করে শরি'আতের বিধান দিয়েছেন। ইসলামী শরি'আতের অন্তর্ভুক্ত মানবাধিকারের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো জীবন রক্ষা, সম্পদ রক্ষা, বংশরক্ষা, জ্ঞান রক্ষা ও ধর্ম রক্ষা। এছাড়া সৃষ্টিতে ও মৌলিক গুণাবলিতে সব মানুষ যেসব অধিকার ধারণ করে সেগুলো হলো জন্মগত অধিকার, স্বাভাবিক জীবন ধারণের অধিকার, মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু তথা খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অধিকার। [১২১] আল্লাহ মানুষকে তার প্রতিনিধির মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করে আসমান ও যমিনের অসংখ্য নিয়ামত মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করে বুদ্ধি-বিবেক ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। ইসলামের শিক্ষা হলো সব মানুষ একই উপাদান থেকে তৈরি; সবাই আল্লাহর বান্দা, সব মানুষ একই পিতামাতার সন্তান। একই রক্তে-মাংসে গড়া। তাই সাদা-কালোতে কোনো ভেদাভেদ নেই। ইসলাম ইবাদাতে যেমন নারী-পুরুষে সমমর্যাদা দিয়েছে, তেমনি সম্পদে দিয়েছে যথার্থ অধিকার।[১২২] ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত মুসলিম ও অমুসলিম সকল নাগরিকের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলাম গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

''দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেননি।' [১২৩] এমনকি বহি:রাষ্ট্রের সাথেও সমান আচরণ প্রদর্শন যদি না তারা ইসলামের ক্ষতিসাধন করে। ইসলামের মানবাধিকার চর্চার যে সামগ্রিক রূপ প্রয়োগ করে তা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নির্দেশনা সকলের উপর বর্তায়। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যবোধ হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচায়ক। অথচ ইসলাম আগমনের অনেক পরে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টমাস পেইন [১২৪] মানবাধিকার শব্দ ও ধারণাটি প্রথম প্রচার করেন। আধুনিক কালে এই অধিকারের দাবি প্রথম স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবীদের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যে দিয়ে । আমেরিকার স্বাধীনতার ১৭৯১ সালে সংবিধানে 'বিল অব রাইটস বা অধিকারের বিল গৃহীত হয়। যার ফলে ব্যক্তির নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। তারপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর গৃহীত হয় সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ। United Nations ঘোষিত মানবাধিকার যে সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। [১২৫] সেকুল্যাররা ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মপালনে স্বাধীনতা নেই বলে যে অপপ্রচার চালায় তার জবাব হলো ইসলামে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। এ রাষ্ট্রে কাউকে জোড় করে ধর্মান্তরিত করানো হয় না। স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তার বিপরীতে কাউকে যদি ইসলাম গ্রহণের বাধ্য করা হয় তবে গ্রহণযাগ্য হবে না। ঈমান গ্রহণের পূর্বশর্তই হলো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। এ জন্য কুরআনে ফেরআউনের ঈমানকে প্রত্যাখান করা হয়েছে। যেহেতু সে সমুদ্রের অতল গহ্বরে বাধ্য হয়ে কালিমা শাহাদাহ পাঠ করেছিল।[১২৬] এছাড়া অসংখ্য কাওমের ঘটনা কুরআনে বিবৃত হয়েছে যারা আল্লাহর আযাবকে চাক্ষুষ দেখে ঈমান গ্রহণের চেষ্টা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ﴾ 'সুতরাং তারা যখন আমার আযাব দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করল না। এটা আল্লাহর বিধান, তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে।

আর তখনই কাফিররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে’।[১২৭]তাই বিশ্বাস গ্রহণের স্বাধীনতা সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মত্যাগীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রে যদি ধর্মত্যাগের প্রবণতা বিস্তার লাভ করে এবং সামষ্টিকভাবে তা চর্চা শুরু হয় তবে তা সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকের কর্তব্য হচ্ছে তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিহত করা। হযরত আবু বকর রা. সাহাবিদের নিয়ে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন। তিনি যদি তা ছেড়ে দিতেন তবে মুসায়লমা, সাবাহ, আসওয়াদসহ মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদারদের সৃষ্ট ফিতনার কারণে ইসলামের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। ইসলামে মুরতাদদের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান সকলের ঐক্যমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নয়। সাহাবিদের মধ্যে ওমার রা., তাবেয়ীদের মধ্যে হতে আন-নাখয়ি ও ইমামদের মধ্যে আস-সাওরি রহ. কারাবন্দি রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১২৮] তাওবার মাধ্যমে পুনরায় ফিরে আসার সামগ্রিক প্রয়াস চালানোর কথাও বলা হয়েছে।

৭. ইসলামে রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান

ইসলামী সমাজ গড়ে উঠেছে মুসলিম নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতায়। এখানে নারীকে পুরুষের বা পুরুষকে নারীর সেবাদাসে পরিণত করা হয়নি। মৌলিকভাবে প্রতিটি মানুষ সমান। আল্লাহর কাছেও মানুষ সমান । এখানে নারী ও পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। মানুষের মূল হচ্ছে রুহ বা আত্মা, শরীর নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,‘স্মরণ করো যখন বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন।’’[১২৯] তাই মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এক এবং সে মানুষ হিসেবে সমান।[১৩০] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সর্বোত্তম করে সৃষ্টির কথা বলেছেন, পুরুষদের নয়। নারী পুরুষের মৌলিক সাম্য হলো আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। সকল মানুষ এক পরিবারের, আদম ও হাওয়ার পরিবারের। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ‘হে মানবজাতি. তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে বহু নর-নারী।’[১৩১] তার মানে হলো আমরা বনি আদমের পরিবারের। ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানব জাতি একই পরিবারের। আল্লাহর কাছে সব মানুষের সম্মান মর্যাদা সমান। আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি তাকওয়া।[১৩২] তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টির সময় বলে দিয়েছেন তোমরা সবাই খলিফা। আল্লাহ তা‘আলা বলেননি নারী বা পুরুষ পাঠাচ্ছেন। মানুষকে তিনি খলিফা নামে অবিহিত করেছেন। আমরা পুরো মানব জাতি আল্লাহর প্রতিনিধি। অন্যায়, অত্যাচার, খুন খারাবির ফলে খলিফার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়, ঈমান থাকে না।[১৩৩] ইসলাম চায় প্রত্যেককে ক্ষমতায়িত করতে। নারীরা বঞ্চিত হলে যেমন তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে তেমনি পুরুষরা বঞ্চিত হলে তাদেরকেও ক্ষমতায়িত করতে হবে। কোন মেয়ে যদি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তে ঘরে থাকতে চায় তবে তার সেটা করার অধিকার আছে। কিন্তু আল্লাহ বলেননি নারীদের ঘরে থাকতে হবে ও বাহিরের কাজ করতে পারবে না। বরং আল্লাহ মূল দায়িত্ব নারী পুরুষকে একই দিয়েছেন। যেমন এসব কথার মাধ্যমে ইসলাম নারীদের সকল ভালো কাজে অংশগ্রহণের স্বীকৃতি দিয়েছে । এটাই ইসলামের নীতি। উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে নারী পুরুষ উভয়ই সমান। পাশ্চাত্য সামাজিকতা ও ইসলামী সামাজিকতার পার্থক্য এখানেই সুস্পষ্ট হয়েছে। পাশ্চাত্য শিল্পবিপ্লব পূর্বে নারী ছিল পুরুষের গোলাম এবং পরবর্তীতে উভয়ই সমান সত্ত্বা ও সমান কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। কিন্তু ইসলামী সমাজে নারী কখনোই পুরুষের গোলাম ছিল না। উভয়ই ছিল স্বাধীন সত্ত্বার অধিকারী। তবে উভয়েই সমান কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল না। নারী পুরুষের অধীনস্থ হলেও তার স্বাধীন সত্ত্বাকে আহত করা হয়নি। পাশ্চাত্য সমাজে প্রথমে কর্তৃত্ব একজনের হাতে ছিল এবং অন্যজনকে তার গোলামে পরিণত করা হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর কর্তৃত্ব উভয়কে দেওয়া হয়। ফলে সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের সম্মান ও অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। একজন মানুষ হিসেবে, একজন নারী হিসেবে, কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে। সর্বোপরি সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে প্রভূত মর্যাদা দিয়েছে। কুরআনের আয়াত, রাসুলের বাণী, সাহাবায়ে কেরাম ও খোলাফায়ে রাশেদার আমল সুস্পষ্টভাবে নারীদের মর্যাদাপূর্ন অবস্থানের স্বীকৃতি দেয়। কুরআনের আয়াতে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে নারী-পুরুষের সমান অবস্থানের কথা ঘোষিত হয়েছে।[১৩৪] সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণেও তাদের সমান দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে।[১৩৫] তাই ইসলাম ধর্মের সাথে নারীদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। ইসলাম ধর্মে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যর গন্ডি গৃহাভ্যন্তরে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি বরং তার সামাজিক অংশগ্রহণ অনুমোদন করেছে। ইসলাম সত্যিকার অর্থে নারীকে ক্ষমতায়িত করেছে এবং নারীকে সম্মানিত করেছে। ইসলাম আগমনের অনেক পরে আধুনিক বিশ্বে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ একটি সনদ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে **১৯৭৯** সালে **১৮** ডিসেম্বরে গৃহীত হয় যা সিডো (CEDAW) সনদ নামে পরিচিত।

৮. সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস ইসলামী সংস্কৃতি কিংবা পলিটিকাল ইসলাম নয়

বিশ্বায়নের এই যুগে "সন্ত্রাসবাদ" শব্দটি এক বহুল ব্যবহৃত ও বিতর্কিত রাজনৈতিক পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত হামলার পর থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে "ইসলামী সন্ত্রাসবাদ" (Islamic Terrorism) ধারণাটি মিডিয়া ও নীতিনির্ধারকদের ভাষায় প্রায় প্রতিদিন উচ্চারিত হয়। ফলত একটি সুপরিকল্পিত প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।[১৩৬] ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলাম কখনোই সহিংসতা বা নিরীহ জনগণের হত্যাকে বৈধতা দেয়নি। ইসলাম কোনোভাবেই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না; বরং ন্যায়, শান্তি ও মানবমুক্তির আদর্শের প্রতীক। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে,"যে ব্যক্তি কোনো প্রাণকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"[১৩৭] রাসুলুল্লাহ সা. এর জীবনাদর্শে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় যেখানে তিনি যুদ্ধের সময়ও নারী, শিশু ও নিরীহ নাগরিকদের উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতি ও সন্ত্রাসবাদকে একসূত্রে গাঁথা এক ধরনের রাজনৈতিক অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। বিশ শতকের মধ্যভাগে যখন উপনিবেশবাদ বিলুপ্ত হয়, তখন মুসলিম বিশ্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ ওঠে। এই আন্দোলন পশ্চিমা আধিপত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ফলে ইসলামোফোবিয়ার বা ইসলামভীতির একটি নতুন রাজনৈতিক রূপ তৈরি হয়। ইসলামী সংস্কৃতি ও পলিটিক্যাল ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের উৎস হিসেবে দেখানোর এই প্রচেষ্টা পশ্চিমা উপনিবেশবাদী চিন্তারই এক সম্প্রসারিত রূপ। এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Covering Islam-এ উল্লেখ করেন যে পশ্চিমা গণমাধ্যম ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন এটি সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতার ধর্ম।[১৩৮] এই মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ভীতিই পরবর্তীতে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের সাথে সংযুক্ত করার ভিত্তি তৈরি করে। আমেরিকার লিবারেল বা কনজারভেটিভ উভয় গোষ্ঠীই ভুলের উপর রয়েছে। তারা সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে অভ্যন্তরীণ ওয়ার অন টেররের সংজ্ঞাকে প্রসারিত করে। ইসলামী সংস্কৃতি কিংবা পলিটিকাল ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস বলে তারা ইসলামোফোবিয়ার প্রচার ও সহিংস রাজনীতির প্রেক্ষাপট সাজায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁরা মূলত ইসলামভীতি ছড়ায়। পশ্চিমা মিডিয়া মুসলমানদের সন্ত্রাসী বা জঙ্গিগোষ্ঠী বলে নেতিবাচক খবর ছড়িয়ে ইসলামভীতি সৃষ্টি করে। ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামভীতি মূলত মুসলিম বিদ্বেষী বর্ণবাদের একটি নতুন রূপ। প্রকৃতপক্ষে সরকারই সন্ত্রাসবিরোধী কর্মতৎপরতার নামে ইসলামোফোবিয়ার কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করছে। যা দৈনন্দিন জীবনে নানা ক্ষেত্রে মুসলমান নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন সহ বিশ্বজুড়ে অগণিত নিষ্পাপ জীবন কেড়ে নিয়েছে ওয়ার অন টেরর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থনে ইসরাইল বাহিনী গাজায় অসহায় ও অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর ওপর ১৮ মাস ধরে হামলা চালিয়ে এ পর্যন্ত ৬২ হাজারের মতো ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু। সেখানকার প্রায় ২০ লাখ অনাহারক্লিষ্ট ও সুপেয় পানির অভাবে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করলেও তথাকথিত বিশ্ববিবেক অন্ধ। একচ্ছত্র ক্ষমতার দাপটে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সিএনএনের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেন ইসলাম নাকি তাদেরকে ঘৃণা করে। এর মাধ্যমে তিনি ২০০ কোটি মানুষের ধর্মকেই সরাসরি আক্রমণ করে বসেছেন। এই বিস্ময়কর তিরস্কারের মধ্যে দিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইসলামোফোবিয়াকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। ট্রাম্পের এই অবিশ্বাস্য সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী মন্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করেন।[১৩৯] সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বব্যাপী নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে ইসলামোফোবিয়ার মতো একটি মতাদর্শের আবিস্কার করে। সকল বর্ণবাদই রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নির্মিত। এর মাধ্যমে সরকার সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞাকে প্রসারিত করে সক্রিয়ভাবে উসকানি, অর্থায়ন কিংবা সন্ত্রাসী হামলার বদলে কোন নির্দিষ্ট মতাদর্শের অনুসারীদের এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলস্বরূপ তারা বিপুল সংখ্যক মানুষের সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত ক্রিয়াকলাপকে নজরদারির আওতায় নিয়ে আসতে পেরেছে। সেজম্যানের গবেষণার মতো ভিক্টোরিওভিচের গবেষণায়ও সহিংসতার কারণ আলোচনার পরিবর্তে ধর্মীয় মতাদর্শ নিয়ে প্রশ্নতোলা হয়েছে। সামাজিক মনস্তত্ত্বের কারণে ব্যক্তি চরমপন্থায় সক্রিয় হয়। তাই মুসলিম মনস্তত্ত্বকে সহিংসতার কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা অযৌক্তিক। অন্যদিকে আল মহাজেরিন প্রথমবারের মতো সহিংস কর্মকান্ডের অনুমোদন দেয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের জন্য, ধর্মীয় মতাদর্শের জন্য নয়।[১৪০] এছাড়া ভিক্টোরিওভিচ তার র‍্যাডিকাল রাইজিং গবেষণাপত্রে বৈষম্যের শিকার,রাজনৈতিক দমন-নিপীড়ন,আত্মপরিচয়ের সংকট, সচেতনতা বৃদ্ধি বা কেনো কর্মীর প্ররোচনাকে চরমপন্থার বা র‍্যাডিকেলাইজেশনের জন্য দায়ী করেন।[১৪১] ১৯৯৭ সালে উইলিয়াম ম্যাকফারসন তদন্ত কমিশন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে প্রাতিষ্ঠানিক বর্ণবাদকে ব্যাপক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে। ১৯৮৪ সালে শিখদের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় প্রশাসনের আক্রমন, ১৯৯১ সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফলে

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। নব্বইয়ের দশকে যেসব মুসলিম ছাত্ররা ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো তারাও অসংখ্যবার বর্ণবাদী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। ব্যক্তিপর্যায়ের মতো প্রশাসনিক পর্যায় থেকেও সমানভাবে তারা বৈষম্যের শিকার হয়। বসনিয়াহ সহ মুসলিম বিশ্বে জাতিগত নিধনের ফলশ্রুতিতেই রাজনৈতিক ইসলামের প্রতি মুসলিম যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে। তাদের লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক প্রভাবকে আক্রমণ করে ধর্মীয় মৌলিকত্ব অন্তর্ভুক্ত করা। ফলে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলেমিন ও ভারত উপমহাদেশে জামায়াতে ইসলামীর হাতধরে রাজনৈতিক ইসলামের বিকাশ ঘটে।

Findings (গবেষণার ফলাফল)

এই গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নির্দেশ করে যে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। প্রথমত, ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার প্রবণতা ইসলামের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক অনুশাসন নয়; বরং এটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সমন্বিত জীবনব্যবস্থা। সুতরাং ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছেদ ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার মূল ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়।[১৪২] দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্র নিয়ে বিতর্ক আধুনিক ইসলামী চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে। গবেষণায় *প্রতীয়মান* হয় যে, গণতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্রে "শুরা" ধারণার আধুনিক রূপ হতে পারে, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ ও পরামর্শ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রশিদ আল-ঘানুসির বিশ্লেষণে দেখা যায়, গণতন্ত্র বিদআত নয়, বরং এটি ইসলামী পরামর্শভিত্তিক শাসনের বাস্তব রূপ।[১৪৩] একইভাবে, মুহাম্মদ আসাদ তাঁর রচনায় প্রমাণ করেন যে, ইসলাম গণতন্ত্রের নৈতিক দিকগুলোকে সমর্থন করে, কারণ এতে ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা নিহিত।[১৪৪] তৃতীয়ত, শাসন ও আইন বিষয়ে উম্মাহর মতবিরোধ, বৈশ্বিক ঔপনিবেশিক প্রভাব, এবং সংখ্যালঘু ও মানবাধিকারের প্রশ্নে প্রোপাগান্ডা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো মুসলিম সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করেছে, যার প্রভাব এখনো বহাল রয়েছে। নারী অধিকার ও মানবাধিকার ইস্যুতেও ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা প্রচার করে আন্তর্জাতিক পরিসরে ইসলামী রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বিকৃত করা হচ্ছে। এসব সংকট অতিক্রমের কার্যকর উপায় হলো ইজতিহাদের নবজাগরণ, শিক্ষার ইসলামীকীকরণ, রাজনৈতিক ঐক্য, সামাজিক সংস্কার, ও ধর্মনিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী রাষ্ট্র তখনই স্থিতিশীল হতে পারে, যখন রাষ্ট্রনীতি কুরআন ও সুন্নাহর নৈতিক দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হবে এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক দায়িত্ববোধ নিশ্চিত হবে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কেবল আধ্যাত্মিক কল্যাণই নয়, বরং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার নিশ্চয়তাও প্রদান করে। সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথটি দুর্গম হলেও তা মুসলিম সমাজে ন্যায়বিচার, সমতা ও নৈতিকতার আদর্শ পুনরুজ্জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য আকাঙ্ক্ষা হিসেবে বিদ্যমান।

উপসংহার

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জিং বিষয়। যুগে যুগে নবী-রাসূলরা ইসলাম বিদ্বেষীদের কাছে থেকে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন, আসমানী কিতাব ও রিসালাতের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য ও প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকবেলা করেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন। তাই মুসলিম উম্মাহকেও সকল মতবিরোধ ও মতানৈক্য ভুলে গিয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এক কাতারে শামিল হয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের আরোপিত সকল প্রোপাগান্ডা ও অভিযোগের সময়োপযোগী জবাব দিতে হবে । উম্মাহর মাঝে রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশ্নে অনৈক্য, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও হীনমন্যতা যেন রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিপর্যস্ত করে না তোলে। দা'য়ীদের এ বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না যে মতভিন্নতা মানেই অনৈক্য নয়; বরং কিছু কিছু মতভিন্নতার মাঝেই রয়েছে ঐক্যের পথ। মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল প্রকার ভেদাভেদ ও বিরোধের অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। যে ঐক্য মানুষের মাঝে শত্রুতার পরিবর্তে ভালোবাসা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্বের বীজবপন করে। যে ভ্রাতৃত্ববোধ পরস্পরকে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে একতাবদ্ধ করে। কাফির ও মুশরিকদের সকল প্রকার গোপন ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র সমূলে ধ্বংস করে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর করে। তাই সকল প্রকার চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ি পরিহার করে ভিন্নধর্মাবলম্বী ও ভিন্নমতাবলম্বী প্রতিপক্ষের বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত দাওয়াতের আলোকে অগ্রসর হতে হবে। মতবিরোধ ও অপপ্রচার মোকাবেলার সময় মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীতে এমন কোন ব্যবস্থা নেই যার প্রতি সকল মানুষ সন্তুষ্টি ও একমত হতে পারে। একজন মু'মিনের ইমানি শক্তি, ধর্মীয় মর্যাদাবোধ আল্লাহর পথে জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের জন্য অপরিহার্য। বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আদর্শের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ আবশ্যক। ব্যক্তি বা দলের বাড়াবাড়ি ও কঠোরনীতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে। মনে রাখতে হবে এ ধরণের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্য সমাজব্যবস্থা, সরকার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমসহ শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি বিভাগই দায়ী। এ থেকে উত্তরণের জন্য আলেমদের নিত্য-নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইজতিহাদ সম্পর্কে নতুন করে ভাবা যেমন দরকার তেমনি শরি'আর স্থির অপরিবর্তনীয় ও স্বীকৃত নীতিমালাকে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই। তাই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল প্রকারের চরমপন্থা পরিহার

করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিষয়ে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মুসলিম সমাজকে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সঠিক মতামত তুলে ধরে সত্যের ওপর দৃঢ় ও অটল থাকতে হবে। তাহলে প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলিম উম্মাহর মাঝে মজবুত বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ যে বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত মঞ্জিলে পৌছানোর পথ সহজ ও প্রাণবন্ত করবে। পাশ্চাত্যে সেক্যুলারদের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে এ পথে অগ্রসর হওয়ার যুগোপযোগী কর্মসূচী নিয়ে সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। রাজনৈতিক ইসলাম বা পলিটিকাল ইসলাম নামের প্রোপাগান্ডায় ফাঁদে পড়ে মনোবল হারনোর কোন সুযোগ নেই। গণতন্ত্রের বিকল্প কোন রাজনৈতিক রূপরেখা উম্মাহর সামনে স্পষ্ট না হওয়াা পর্যন্ত ইসলামী গণতন্ত্রের রূপরেখা কেমন হবে তা আলেমদের কাছে স্পষ্ট করে সকল মতবিরোধের নিস্পত্তি জাাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিতে হবে। নারীদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে নারীরা আরো বেশি সম্মানিত হবেন এবং আরো বেশি অধিকার ভোগ করবেন। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরাও মুসলমানদের মতোই নিরাপত্তা ও অধিকার ভোগ করে এ বিষয়টির প্রচার ও প্রসার অমুসলিম নাগরিকদের উৎকন্ঠার অনেকটাই নিরসন করবে। বৈশ্বিক প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কাঙ্ক্ষিত ইসলামী পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে সকল ষড়যন্ত্রের বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলা করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইসলামে চরমপন্থা বা জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই। মুসলিম যুবকরা যেন চরমপন্থার পথে অগ্রসর না হয় সে জন্য আলেমদের সে বিষয়ে বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ও প্রচারণা চালানো দরকার। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, ইসলামী শরি'আহ আইন সম্পর্কিত নসসমূহের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ঐক্যমতে পৌঁছানো না গেল বিশ্বব্যাপী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সংকটের মুখে পড়বে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড.ইউসুফ আল কারজাভি রহ., *সেক্যুলার ও ইসলামপন্থিদের বয়ানে ইসলাম ও রাজনীতি* (ঢাকা :গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ২০২৩ খ্রি.), পৃ.৮৮।

২ Arun Kundnani, *Islamophobia in the Western World* (London: Pluto Press, 2014), p. 56.

৩ শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, *ইসলাম: রাষ্ট্র ও সমাজ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, জুলাই ১৯৭৭ খ্রি.পৃ. ১১৬।

৪ ড. উমার সোলাইমান আশকার, *আল্লাহর আইন পরিবর্তনে পৃথিবীর কী ক্ষতি হলো?* (ঢাকা: হাসানা পাবলিকেশন, নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.), পৃ. ১১।

৫ জাস্টিস মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, *ইসলাম ও রাজনীতি* (ঢাকা: মাকতাবুল হেরা,ষষ্টাদশ মুদ্রণ, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ১৬২ ।

৬ ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৫৫-৮০।

৭ ড. মুনীরউদ্দীন আহমদ, *ইসলামী অর্থনীতি ও কল্যাণ রাষ্ট্র* (ঢাকা: আদর্শ, ২০১৫), পৃ. ৭৭-১১০।

৮ Rashid al-Ghannushi, *Public Freedom in the Islamic State* (New Haven: Yale University Press, 1992), P.45.

৯ Sayyid Abul A'la Maududi, *Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publications, 1960), pp. 145–146

১০ অধ্যাপক ফজলুর রহমান, *রাষ্ট্র ও জন-প্রত্যাশা* (সিলেট: পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.),পৃ.৫-৬।

১১ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً﴾, ''স্মরণ করো! যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন,' নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।'' দ্র. সূরাহ্ আল-বাকারাহ, ২:৩০।

১২ সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৩।

১৩ ড. মো. বেলাল হোসেন, *ইসলামে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক* (রাজশাহী: রেনেসাঁ পাবলিকেশন্স, মার্চ ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১০৩।

১৪ আল-মাওয়ার্দী,*আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.),পৃ. ৫।

১৫ মাওলানা আব্দুর রহীম, *আল কুরআনের রাষ্ট্র ও সরকার* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৫ খ্রি.),পৃ. ১৫০।

১৬ মুহাম্মদ আসাদ, *ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি* (ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০১৩), পৃ. ১২।

১৭ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ 'শুনে রেখ, তারই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।'' দ্র. সূরাহ্ আল-আ'রাফ, ৭: ৫৪।

১৮ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤی اَهْلِهَا وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِیْعًا بَصِیْرًا﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমার আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেবে। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করো তখন ন্যায়ভিত্তিক ফাযসালা করো। আল্লাহ তোমাদের উত্তম উপদেশ দান করেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।'' দ্র. সূরাহ্ আন-নিসা, ৪:৫৮।

১৯ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰی بَیْنَهُمْ ''পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তারা তাদের নিজেদের কার্যাবলি সম্পাদন করে', দ্র. সূরাহ্ আশ-শুরা, ৪২: ৩৮।

২০ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اَلَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ﴾ ''তারা এমন লোক যাদের আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই দিকে।'' দ্র. সূরাহ্ আল-হজ্জ, ২২: ৪১।

২১ সূরাহ্ আন-নূর, ২৪: ৫৫।

২২ 'Secularism is most commonly thought of as the separation of religion from civil affairs and the state and may be broadened to a similar position seeking to remove or to minimize the role of religion in any public sphere.'দ্র: *https://en.wikipedia.org/wiki/Secularism, Dated: 27.09.24*

২৩ **المعاملات**:

هي كل ما يتعلق بالمعاملات المالية والاجتماعية بين الناس وفق الشريعة الإسلامية، بما في ذلك البيع والشراء والاقراض والشراكة والعقود وكل ما ينظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع.'মুয়ামালাত হলো ইসলামী শরি'আহ অনুযায়ী মানুষের মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক লেনদেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্য,ঋণ,

অংশীদারি, চুক্তি এবং সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে।" দ্র. ইবনু কুদামা, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, আল-মুগনি ফি আল-ফিকহ, ৫ম খন্ড (বেরূত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৮০।

[২৪] ড. ইউসুফ আর কারজাভী রহ. *সেক্যুলার ও ইসলামপন্থীদের বয়ানে ইসলাম ও রাজনীতি* (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি.),পৃ. ৭০-৭১।

[২৫] 'He claimed that his experience and reading of history showed him that politics has always involved deception, treachery, and crime. He also notably said that a ruler who is establishing a kingdom or a republic, and is criticized for his deeds, including violence, should be excused when the intention and the result are beneficial to him. দ্র: *https://en.wikipedia.org/wiki/Niccolo_Machiavelli, Dated: 27.09.2024*

[২৬] *ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

[২৭] সূরাহ্ আল-ইউসুফ, ১২: ৪০।

[২৮] আবদুল মুনইম মুস্তফা হালিমা, *ইসলাম ও রাজনৈতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা*, অনুবাদ: আম্মারুল হক (ইউএস, সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি.), পৃ. ৩৯।

[২৯] সূরাহ্ আল আন'আম, ৬: ১১৬।

[৩০] এহসানুল হক জসীম, *বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ* (ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স,অক্টোবর, ২০২০ খ্রি.), পৃ. ৪৬।

[৩১] সূরাহ্ আশ-শূরা, ৪২:৩৮।

[৩২] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ''আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী' দ্র: সূরাহ্ আল-মায়েদা, ৫: ৪৪ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ''আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা অনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই ফাসেক" দ্র: সূরাহ্ আল-মায়েদা, ৫: ৪৫, দ্র: সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্, ৫: ৪৭।

[৩৩] সূরাহ্ আল-মায়িদাহ্, ৫: ৪৯।

[৩৪] সূরাহ্ আল-জাসিয়া, ৪৫: ১৮।

[৩৫] *সেক্যুলার ও ইসলামপন্থিদের বয়ানে ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬৭।

[৩৬] সূরাহ্ আন-নিসা, ৪ : ৫৮-৫৯।

[৩৭] **Lord Thomas Babington Macaulay (1800–1859)** was a British historian, politician, literary figure, and colonial policymaker who exerted a profound influence on the education system in British India. In 1835, he authored his famous report, *Minute on Indian Education*, which played a pivotal role in shaping colonial educational policy. In this report, Macaulay argued for the creation of a class of Indians who would be "Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."দ্র. Thomas Babington Macaulay, *Minute on Indian Education* (London: Her Majesty's Stationery Office, 1835), 3–7.

[৩৮] আবদুল রশিদ মতিন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত* (ঢাকা: ইনস্টিটিউট অব ইসলামীক থ্যট, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২১।

[৩৯] *রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইসলামী প্রেক্ষিত,প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।*

[৪০] শাহ আব্দুল হান্নান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন* (ঢাকা: বুক মাস্টার পাবলিকেশনস, সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১১৬।

[৪১] প্রফেসর ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি* (ঢাকা: বুকমাস্টার প্রকাশনস্, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২৩।

[৪২] ইবনু কাসির বলেন,'মুতাশাবিহ আয়াত হলো সেসব আয়াত, যেগুলোর অর্থ শুধুমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষ সেগুলোর গভীর ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে অক্ষম।"দ্র. ইসমাঈল ইবন্ উমার ইবন্ কাছীর আল কুশায়রী আদ্-দিমাশকী, তাফসিরুল কুরআনিল 'আযিম (মিশর : দারুল ইহইয়াইল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ),২য় খন্ড, পৃ. ৬। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ "তিনি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এতে কিছু আয়াত মুহকাম সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ।" দ্র. সূরাহ্ আলে-ইমরান : ৩: ৭ ।

[৪৩] আরবি 'মুহকাম' (مُحْكَم) শব্দের আভিধানিক অর্থ হল,সুদৃঢ়, মজবুত, শক্ত,স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন,সঠিক, যথাযথ, সুসংহত। ইমাম ইবনু আল-জাওযী রহ. তাঁর গ্রন্থ 'যাদ আল-মাসীর' এ বলেন, 'মুহকাম হলো এমন আয়াত যার অর্থ খুবই স্পষ্ট, যাতে দ্বিতীয় কোনো অর্থের সম্ভাবনা থাকে না। এই আয়াতগুলোতে সাধারণত ফারায়েজের বিধান, আকায়েদ, ইবাদত, আদেশ-নিষেধ এবং হালাল-হারামের বর্ণনা এসেছে। দ্র. 'আব্দুর রহমান ইব্নুল জাওযী, যাদুল মাসীর ফী 'ইলমিত্ তাফসীর(বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৫৮., ﴿هو ما كان لفظه واضح الدلالة، لا اشتباه فيه، ولا يحتمل إلا معنى واحداً، ويُعتمد عليه في بيان الأحكام الشرعية﴾. দ্র. তাফসিরুল কুরআনিল 'আযিম, প্রাগুক্ত, খন্ড ২, পৃ. ৫।

[৪৪] "মুকাল্লিদ ﴿هو الذي يتبع قولَ غيره من العلماء من غير أن يعرف دليلَه، ولا يقومُ بالاجتهاد بنفسه في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة التفصيلية﴾ সেই ব্যক্তি, যিনি অন্য আলেম বা ইমামের বক্তব্য ও মতামত অনুসরণ করেন, অথচ নিজে তার দলিল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন না এবং শরি'আহর বিধান নির্ধারণে নিজে ইজতিহাদ করেন না।" দ্র. আশ-শাতিবি, ইবনু ইসহাক, আল-মুওয়াফাকাত ফি উসূলিশ শরি'আহ, ৫ম খন্ড (কায়রো: দারুল মারিফ, ১৯৯৭), পৃ. ১০১।

[৪৫] শায়খ আব্দুল হাই ফারুকী, *উম্মাহর বিভেদ ও ঐক্য* (দুবাই: কোরআন মজলিশ, ডিসেম্বর ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৩।

[৪৬] *মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক বিরোধ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ।

[৪৭] Rashid al-Ghannouchi, *Public Freedoms in the Islamic State*, trans. Khalid Masud (New Haven: Yale University Press, 1993), 122–136.

[৪৮] *বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

[৪৯] 'নারীবাদ এক ধরনের রাজনৈতিক, আদর্শগত ও সামাজিক আন্দোলন যার সাধারণ লক্ষ্য হলো : নারীর জন্য সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক,ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অধিকার সমূহ প্রতিষ্ঠা করা। এটি নারীর জন্য সমান শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ পাওয়ার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।" দ্র. ড. আবদুল লতিফ মাসুম, *একবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তা* (ঢাকা: মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৯৩ ।

[৫০] নারী অধিকার: পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম ইসলাম কী নারীবাদ বিরোধী?, বিবিসি বাংলা, ৮ মার্চ ২২ খ্রি.।

[৫১] আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, *রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা*, ১ম খন্ড (ঢাকা: ইনস্টিটিউট অব ইসলামীক থ্যট, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১১ খ্রি.), প, ৪।

[52] Radicalization is the process by which an individual or a group comes to adopt increasingly radical views in opposition to a political, social, or religious status quo. *https://en.wikipedia.org/wiki/Radicalization, Dated 27.03.25*

[৫৩] অরুণ কুন্দনানি, *ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড* (ঢাকা: ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০২২ খ্রি.) পৃ. ৩৫।

[৫৪] *ইসলামোফোবিয়া ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

[৫৫] *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

[৫৬] *ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

[৫৭] সূরাহ্ আল-আনফাল, ৮:২৫।

[৫৮] ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ., *শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা* (ঢাকা: আহসান, পাবলিকেশন্স, জানয়ারী ২০০৮ খ্রি.),পৃ. ৪৭।

[৫৯] ড. মাইমুল আহসান খান, *রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি আইন ও মানবাধিকার* (ঢাকা: সেলফ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ খ্রি.),পৃ. ১৪।

[৬০] **هو الاشتباك المسلح بين طرفين أو أكثر في سبيل الله، وفق الشريعة الإسلامية، ويشمل الدفاع عن الدين، النفس، العرض، والممتلكات، مع مراعاة الضوابط الشرعية.**‘ “কিতাল হলো শরি‘আহ অনুযায়ী আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংঘর্ষ বা যুদ্ধ, যা ধর্ম, জীবন, সম্মান এবং সম্পদের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, এবং এতে শরি‘আহর বিধি ও সীমাবদ্ধতা অনুসরণ করা হয়।” দ্র. তাফসিরুল কুরআনিল আযিম, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড,পৃ.২২০।

[৬১] **هو أخذ حقّ المظلوم بنفس ما أُخذ منه، في القتل أو الجرح، وفقاً للشريعة الإسلامية، بحيث يحقق العدالة ويكون رادعاً للجريمة.**‘ কিসাস হলো শরি‘আহ অনুযায়ী নির্যাতিত বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির অধিকার পুনঃস্থাপন করা, যেমন হত্যার ক্ষেত্রে হত্যার সমান শাস্তি বা আঘাতের ক্ষেত্রে সমান প্রতিকার, যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় এবং অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যায়।’ দ্র. আল-মুগনি ফি আল-ফিকহ, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫।

[৬২] সূরাহ্ আন-নাহল, ১৬:৮৯।

[৬৩] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **﴿اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾** ‘তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? অতএব তোমাদের যারা এমন করে তাদের পার্থিব জগতে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ছাড়া আর কী প্রতিদান হতে পারে? এবং কিয়ামাতের দিন তারা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল নন” দ্র: সূরাহ্ আল-বাকারাহ, ২: ৮৫।

[৬৪] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ﴾** হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।’ দ্র: সূরাহ্ আল-বাকারাহ্, ২: ২০৮।

[৬৫] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **﴿وَ اَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ﴾** ’আর তুমি তাদের মধ্যে বিচার ফয়সালা কর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী, তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক তারা যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার কোন কিছু থেকে তোমাকে ফেতনায় না ফেলতে পারে।’ দ্র: সূরাহ্ আল-মায়েদাহ, ৫: ৪৯।

[৬৬] সূরাহ্ আল-আন‘আম, ৬: ১১৪।

[৬৭] যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **﴿اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ﴾** ‘আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন।” দ্র: সূরাহ্ আল মায়েদাহ্, ৬: ১১৪ ।

[৬৮] Harold J. Laski, *A Grammar of Politics* (London: George Allen & Unwin, 1938), 27–30. George Sabine, *A History of Political Theory* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961), 12–15.

[৬৯] ড. মো: মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রুপরেখা* (রাজশাহী: বুকস প্যাভিলিয়ন, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩১৫।

[৭০] Thucydides, *History of the Peloponnesian War*, trans. Rex Warner (London: Penguin Classics, 1972), Book II, p.114.

[৭১] প্রাগুক্ত।

[৭২] আব্দুল মান্নান তালিব, *ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুণর্গঠন* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৬৯।

[৭৩] *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, প্রাগুক্ত, পৃ.* ১২১।

[৭৪] Richard Neustadt, *Presidential Power and the Modern Presidents* (New York: Free Press, 1990), 3–15.

[৭৫] Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven: Yale University Press, 1999), 103–120.

[৭৬] *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[৭৭] H. L. A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1994), 217–222.

[৭৮] *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৩।

[৭৯] *নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৩।

[৮০] ইউসুফ আল-কারযাভি, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামী থ্যট, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১৭২।

[৮১] *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

[৮২] ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, তাইসীরুত তাফসির (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টাটিউট অব ইসলামীক থ্যট, ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি.), পৃ. ১৬।

[৮৩] সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ৫৮।

[৮৪] যেমন রাসূল্লাহ সা. বলেন, **﴿إِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ﴾** ““যখন আমানত নষ্ট হয়ে যাবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো।”লোকেরা জিজ্ঞেস করল, “হে আলণ্ডাহর রাসূল! আমানত নষ্ট হওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে?” তিনি বললেন, “যখন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে ন্যস্ড় করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো। দ্র. ইমাম মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল আল-বুখারি, সহীহ আল-বুখারি, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ৫৯ (বৈরূত: দার ইবনু কাসির, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ২৩।

[৮৫] আল-কুরআন, সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ৫৯।

[৮৬] Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World* (Lahore: Ashraf Press, 1981), p. 15–40.

[৮৭] Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), P.40–60.

[৮৮] *ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

[৮৯] ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *ফিকহুল আকবার* (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ২০১৭ খ্রি.),৩০৩ , দ্র. **مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً** “যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার উপর কোনো ইমাম (শাসক) নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুরূপে মৃত্যুবরণ করল।” ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খন্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৩), পৃষ্ঠা ৯।

[৯০] *ফিকহুল আকবার, প্রাগুক্ত*, সহীহ মুসলিম ৩/১৪৭৬-১৪৭৭, কিতাবুল ইমারহ, বাবুল আমরি বিলুযুমিল জামাআতি।

[৯১] মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ, সহীহ মুসলিম, কিতাব-ইমারা, হাদিস ১৩৩৮ (বৈরূত: দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৭), পৃ. ৩১৯।

[৯২] ইসলাম ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

[৯৩] আল-বেদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ২য়খন্ড, পৃ. ১০।

[৯৪] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِالۡبَیِّنٰتِ وَ اَنۡزَلۡنَا مَعَهُمُ الۡکِتٰبَ وَ الۡمِیۡزَانَ لِیَقُوۡمَ النَّاسُ بِالۡقِسۡطِ ۚ وَ اَنۡزَلۡنَا الۡحَدِیۡدَ فِیۡهِ بَاۡسٌ شَدِیۡدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِیَعۡلَمَ اللّٰهُ مَنۡ یَّنۡصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالۡغَیۡبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیٌّ عَزِیۡزٌ﴾, 'নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদন্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।' দ্রঃ সূরাহ্ আল হাদিদ, ৫৭:২৫।

[৯৫] *ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭।

[৯৬] United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948; United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966.

[৯৭] জিয়াউল হক, *ইসলামী শাসনব্যবস্থা, মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলি* (ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন্স, জানুয়ারী ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ২১০।

[৯৮] সূরাহ্ আল-ইউনুস, ১০: ৯৯।

[৯৯] সূরাহ আল বাকারাহ্, ২: ২৫৬।

[১০০] ড. ইউসুফ আল কারজাভি রহ., *যুগোপযোগী দাওয়াহ(ঢাকা: গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স*, সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রি.),পৃ.২৯২।

[১০১] 'যিম্মীরা হল ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক। মুসলিমদের মতো তারাও রাষ্ট্রের সকল নাগরিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জান-মাল 'ইয্যাত-আব্রু ঠিক মুসলিম নাগরিকদের জান-মাল 'ইয্যাত আব্রুর মতোই মূল্যবান ও পবিত্র বিবেচিত হয়। আরবি ভাষায় 'যিম্মাহ' শব্দটির দায়িত্বভার, সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পার্থিব আইন-কানুন মেনে এবং জিজিয়া আদায় করার শর্তে ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল 'ইয্যাত আব্রুর নিরাপত্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করে থাকে বলে তাদেরকে আহলুয যিম্মাহ বলা হয়।' দ্রঃ ড. আহমদ আলী, *ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা*, গবেষণা সংকলন-১০ (ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার, ফেব্রুয়ারী ২০১০ খ্রি.), পৃ. ১২।

[১০২] *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৩*।

[১০৩] *ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

[১০৪] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الۡحَقِّ مِنَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡکِتٰبَ حَتّٰی یُعۡطُوا الۡجِزۡیَۃَ عَنۡ یَّدٍ وَّ هُمۡ صٰغِرُوۡنَ قَاتِلُوا الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالۡیَوۡمِ الۡاٰخِرِ وَ لَا یُحَرِّمُوۡنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ وَ لَا یَدِیۡنُوۡنَ دِیۡنَ﴾

''তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছে তা হারাম মনে করেনা, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া স্বীকার করে।" দ্র. সূরাহ্ আত-তাওবাহ্, ৯: ২৯।

[১০৫] *ইসলামী শাসনব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২১১।

[১০৬] শেখ মুহাম্মদ শোয়েব নাজির, *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক*, সেমিনার স্মারক গ্রন্থ ২০০৮, বি.আ.সি, ঢাকা, পৃ. ২০১।

[১০৭] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰهِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا﴾ তোমরা একত্রে আল্লাহর রুজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভিক্ত হয়ো না", দ্র.সূরাহ্ আলে- ইমরান, ৩: ১০৩।

[১০৮] *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. xii

[১০৯] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اَلَّذِیۡنَ اِنۡ مَّکَّنّٰهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَوُا الزَّکٰوۃَ وَ اَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهَوۡا عَنِ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَۃُ الۡاُمُوۡرِ﴾ 'তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে'. দ্রঃ সূরাহ্ আল- হজ্জ, ২২: ৪১।

[১১০] ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ, *মুসলিম উম্মাহর ঐক্য* (ঢাকা: সিরাত পাবলিকেশন্স, জানুয়ারি ২০২২ খ্রি.), পৃ.৬।

[১১১] هو الطريقُ أو المنهجُ الذي يسلكه الإنسان في فكره أو سلوكه أو معتقده أو طريقته في فهم الدين والعمل به. 'মাসলাক হলো সেই পথ, পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গি, যা একজন মানুষ তার চিন্তাধারা, আচরণ, বিশ্বাস বা দ্বীনের ব্যাখ্যা ও অনুশীলনে অনুসরণ করে।" দ্র. ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, খন্ড ১০ (বৈরুত: দারুল সাদির, ১৯৯৩), পৃ. ২৩৮।

[১১২] ড. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, *মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক বিরোধ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গি: একটি পর্যালোচনা*, ইসলামী আইন ও বিচার, ভলিউম-১৮, ইস্যু-৬৯-৭০, জানুয়ারী ২০২২ খ্রি., পৃ. ০২।

[১১৩] মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[১১৪] সূরাহ্ আল-আনফাল, ৮: ৪৬।

[১১৫] Said Nursi (1877–1960) was a prominent Kurdish Sunni Muslim theologian and scholar from Turkey, best known for his *Risale-i Nur* collection — a comprehensive commentary on the Qur'an written to strengthen faith in the modern age. দ্র. Mardin, Serif. *Religion and Social Change in Modern Turkey*: The Case of Bediüzzaman Said Nursi. Albany: State University of New York Press, 1989, pp. 102–104.

[১১৬] *মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক বিরোধ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গি,: একটি পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

[১১৭] সূরাহ্ আল-মায়িদা, ৫: ২।

[১১৮] সূরাহ্ আস-সফ, ৬১ : ৪।

[১১৯] Thomas H. Marshall, *Citizenship and Social Class* (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), 28–35.

[১২০] সূরাহ্ বনি ইসরাইল, ১৭ : ৭০।

[১২১] শাইখ মুহাম্মদ উসমান গনী, ইসলামে মানবাধিকারের শিক্ষা ও দশর্ন, দৈনিক প্রথম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি.

[১২২] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ لَهُنَّ مِثۡلُ الَّذِیۡ عَلَیۡهِنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَۃٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ﴾ আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' দ্রঃ সূরাহ্ আল-বাকারাহ্, ২: ২২৮।

[১২৩] সূরাহ্ আল-মুমতাহিনাহ, ৬০: ০৮।

[১২৪] Thomas Paine (February 9, 1737 -June 8, 1809) was an English-born American Founding Father, French Revolutionary, inventor, and political philosopher. His ideas reflected Enlightenment-era ideals of human rights.

[১২৫] 'Human rights include the right to life and liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to work and education, and many more. Everyone is entitled to these rights, without discrimination.*https://www.un.org/en/global-issues/human-rights*, Dated 17.10.2024

[১২৬] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ جٰوَزْنَا بِبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّ عَدْوًا ؕ حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ﴾ ' আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। আর ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, 'আমি ঈমান এনেছি যে, সে সত্তা ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'। দ্র: সূরাহ্-ইউনুস, ১০: ৯০।

[১২৭] সূরাহ্ আল-মুমিন, ৪০: ৮৫।

[১২৮] *ইসলাম ও রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

[১২৯] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰی ۚۛ شَهِدْنَا ۚۛ اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَ﴾ 'আর (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রভু আদম সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করে তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য নিতে বললেন,"আমি কি তোমাদের প্রভু নই?" তারা বলল,"অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।" যাতে তোমরা কিয়ামতের দিনে না বলো, "আমরা তো এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম।" দ্র. সূরাহ্ আল-আরাফ, ৭: ১৭২।

[১৩০] নির্বাচিত সংকলন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

[১৩১] সূরাহ্ আন-নিসা, ৪: ১।

[১৩২] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰی وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ﴾ 'হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহর সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন।' দ্র.: সূরাহ্ আল-হুজুরাত, ৪৯:১৩

[১৩৩] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿هُوَ الَّذِیْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِی الْاَرْضِ ؕ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهٗ ؕ وَ لَا یَزِیْدُ الْكٰفِرِیْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَ لَا یَزِیْدُ الْكٰفِرِیْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا﴾ ''তিনি তোমাদের যমিনের খলিফা করেছেন । সুতরাং যে কুফরি করবে সে কুফরি তারই উপরে বর্তাবে।আর কাফিরদের জন্য তাদের কুফরি তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের জন্য তাদের কুফরি কেবল তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।' দ্র: সূরাহ্ আল-ফাতির, ৩৫:৩৯।

[১৩৪] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِیْنَ وَ الْقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِیْنَ وَ الصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِیْنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الْخٰشِعِیْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِیْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِیْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِیْنَ فُرُوْجَهُمْ وَ الْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِیْنَ اللّٰهَ كَثِیْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِیْمًا﴾ 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীল নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী,যারা নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এমন পুরুষ ও নারী এবং যারা আল্লহকে অধিক স্মরণ করে এমন পুরুষ ও নারী আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।"দ্র: সূরাহ্ আল-আহযাব, ৩৩:৩৫।

[১৩৫] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ ۘ یَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ یُطِیْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ﴾ দ্র: 'বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীরা পরস্পরের অভিভাবক। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরই উপর আল্লাহর দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আলাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। সূরাহ্ আত-তাওবাহ্, ৯: ৭১।

[১৩৬] John L. Esposito, *Unholy War: Terror in the Name of Islam* (New York: Oxford University Press, 2002), 15–17.

[১৩৭] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾ 'যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত, কিংবা তার দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে কোন ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত, তাহলে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল; দ্র. সূরাহ্ সূরা আল-মায়িদাহ ৫:৩২।

[১৩৮] Edward W. Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (New York: Vintage Books, 1997), 45–50.

[১৩৯] আমার দেশ, মাহমুদুর রহমান, মন্তব্য প্রতিবেদন, ২৬ মার্চ ২০২৫ , পৃ.২।

[১৪০] *ইসলামোফোবিয়া*, প্রাগুক্ত,পৃ.১২৩।

[১৪১] *ইসলামোফোবিয়া*, প্রাগুক্ত,পৃ.১২২।

[১৪২] Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 1980), P.45–48.

[১৪৩] Rashid Al-Ghannushi, *The Principles of Islamic Governance* (New Haven: Yale University Press, 2003), P. 25–30.

[১৪৪] *The Principles of State and Government in Islam,* 52–55.